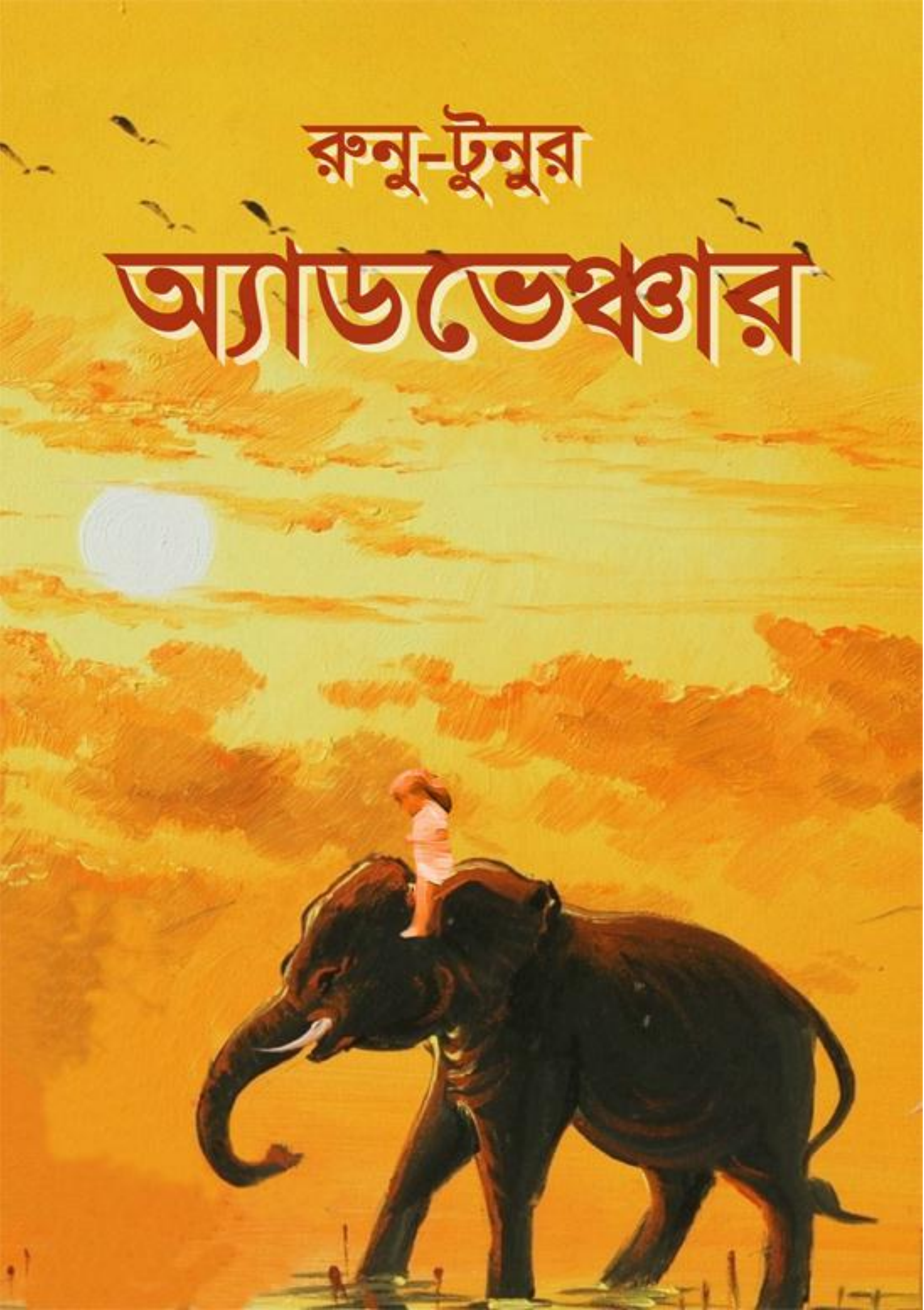
রুনু-টুনুর
অ্যাডভেঞ্চার

রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.dlobl.org

www.boierhut.com/group

প্রথম

টুনু

সে হচ্ছে অরণ্যের স্বদেশ। এবং যারা সেখানে বাস করে, সাধারণত জীব হলেও তারা মানুষ নয়।

সেখানে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হাতির পাল, নদীর তীরে তীরে জলপান করতে আসে হরিণের দল এবং এখানে-সেখানে তাদের উপরে হানা দিতে চায় বড়ো বড়ো বাঘ। প্রকাণ্ড বন্য বরাহ ও তারও চেয়ে বড়ো আর হিংস্র বয়ার, নেকড়ে এবং বিষধর সাপ প্রভৃতি এসব কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

সে যেন সবুজের সাম্রাজ্য। বন আর বন আর বন এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড়। কতরকম বড়ো বড়ো গাছ, কতরকম ফুলন্ত লতা এবং মাঝে মাঝে ঘাসের মখমলে ঢাকা শ্যামল মাঠ। কত রঙের কতরকম বনফুল, আদর করে কেউ তাদের নাম রাখেনি আজ পর্যন্ত। এখান থেকে বহু দূরে নির্বাসিত হয়ে আছে নাগরিক সভ্যতা। স্নিগ্ধ শ্যামলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, বিহঙ্গরাগিণীর ঝঙ্কারে শ্রবণ পূর্ণ হয়ে যায়, কলনদিনী তটিনীর নৃত্যলীলা দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় নয়ন মন।

সারা বনভূমি জুড়ে দিনের বেলায় গাছের উপরে বা গাছের নীচে খেলা করে ময়ূরময়ূরী, হিমালয়ের পারাবত, বন্য হংস ও আর আর নানান জাতের রংবেরঙের পাখি। যতক্ষণ আকাশের পটে মাখানো থাকে রোদের সোনালি, ততক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছন্দ রেখে জেগে থাকে অরণ্যের অশ্রান্ত মর্মরধ্বনির কাব্যসংগীত।

কিন্তু সন্ধ্যা এসে যেই আলো মুছে চারিদিকে মাখিয়ে দেয় অন্ধকারের কালো রং, তখনই থেমে যায় মর্মর সংগীতের সঙ্গে গীতকারী বিহঙ্গদের সঙ্গত। তারপরে সেখানে জাগ্রত হয় যেসব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, তা শ্রবণ করলে মনের

মধ্যে পাওয়া যায় না কিছুমাত্র আশ্বস্তির ইঙ্গিত। গাছে গাছে পেচকদের চিৎকার আনে অমঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বনে বনে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের ভৈরব গর্জনে সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে রোমাঞ্চিত। থেকে থেকে শোনা যায় আসন্ন মৃত্যুর কবলগত আহত জীবদের আর্তনাদ। কখনও হুড়মুড় করে ঝোপঝাপ দুলিয়ে ও পদশব্দে পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলে যায় বন্য বরাহের দল। আবার কখনও বা শোনা যায় হস্তীজননীর কাতর আহ্বান-ধ্বনি—হয়তো জঙ্গলের কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার শাবক। কখনও অন্য কোথাও জাগে বিষম এক ঝটপটানির শব্দ— হয়তো অজগরের মৃত্যুপাকে জড়িয়ে পড়েছে কোনও হতভাগ্য হরিণ।

যতক্ষণ থাকে রাত্রি, যতক্ষণ থাকে অন্ধকার, যতক্ষণ আকাশে ওড়ে বাদুড় আর পেচকরা, ততক্ষণ কিছুতেই নিঃশব্দ হতে পারে না অরণ্যের নির্জনতা। ধ্বনি আর ধ্বনি এবং প্রত্যেক ধ্বনি দিচ্ছে কেবল মৃত্যুর আর হত্যার আর রক্তপাতের সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত।

এমনকি, দিনের বেলায় বনস্পতিদের যে-মর্মরধ্বনির মধ্যে পাওয়া যায় কাব্যের আনন্দ, রাত্রে ভয়াল অন্ধকারের ছোয়াচ পেয়ে সে-ধ্বনিও হয়ে ওঠে ভয়াবহ। বাতাসে গাছের পরে গাছ নড়ে নড়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পৃথিবীর উপরে যেন বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে অপার্থিব অভিশপ্ত আত্মারা। বনের আনাচে কানাচে যেদিকে চলে দৃষ্টি, সেই দিকেই যেন ওত পেতে অপেক্ষা করে থাকে কোনও না কোনও মূর্তিমান ও মারাত্মক বিপদ। এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। দয়ামায়া আসতে পারে না এখানকার ত্রিসীমানায়। কিন্তু এই ভয়ংকর স্থানেও মানুষের আনাগোনা বন্ধ নেই। কাঠ কাটবার বা মধু সংগ্রহের জন্যে এখানে আসে অনেক লোক। ব্যাধরা বেড়ায় জঙ্গলে জঙ্গলে পশুপক্ষী বধ বা বন্দি করবার জন্যে। আরও নানা কাজে আসে আরও নানান রকম লোক। তারা অনেকেই হিংস্র পশুর পাল্লায় পড়ে প্রাণ দেয়, কিন্তু নাগরিক মানুষের তাগিদ মেটাবার জন্যে তবু তাদের এখানে আসতে হয় বারংবার। তারা

সবাই যে প্রত্যহ বনে এসে আবার বন ছেড়ে বাইরে চলে যায়, তা নয়; তাদের অনেকেই বনের এখানে-সেখানে দল বেঁধে বসতি স্থাপন করে। এবং সেইসব বসতির ভিতরে তাদের সঙ্গে থাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও।

যেখান থেকে সবে আরম্ভ হয়েছে বনের রেখা, সেইখানেই এক জায়গায় আছে একখানি বাংলো। সেই বাংলোর ভিতরে বাস করেন অরণ্যপাল বা বনরক্ষক। জাতে তিনি বাঙালি, নাম তার অসিতকুমার রায়। আমাদের কাহিনি শুরু হবে এই বাংলোখানি থেকেই।

ছোটোখাটো বাংলো। খান-তিনেক ঘর। তারপরেই একটুখানি উঠোনের মতো জায়গা, তার পরেই আরও তিনখানি ছোটো ছোটো মেটে ঘর। রান্নাঘর, ভাড়ারঘর ও দাসদাসীদের থাকবার ঘর। বাংলোর চারিপাশেই আছে খানিকটা করে খোলা জমি। তার মধ্যে আছে শাক-সবজি ও ফুল গাছ দিয়ে বাগান রচনার চেষ্টা। জমির চারিদিকেই বাঁশ ও লতাপাতার সাহায্যে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

সকাল। ঝিলমিলে গাছের সবুজের উপরে চিকন রোদের স্বচ্ছ সোনার পাত। চারিদিকে গানের আসর জমিয়েছে কোকিল, শ্যামা ও অন্যান্য পাখির দল এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে ছন্দপাত করছে বেসুরো কাকের দল।

বাংলোর বারান্দায় একটি গোলটেবিলের ধারে বসে অসিত ও তার স্ত্রী সুরমা প্রভাতি চা পান করছিল। অসিতের বয়স তিরিশের বেশি নয় এবং সুরমা তারও চেয়ে দশ বছরের ছোটো। টেবিলের আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মেয়ে রেণুকা, ডাক নাম টুনু। এই মেয়েটি ছাড়া তাদের আর কোনও সন্তান হয়নি।

টুনুর বয়স বছর পাঁচ। ফুটফুটে গায়ের রং, মুখখানি সুন্দর। ঠিক যেন একটি জ্যান্ত মোমের পুতুল।

টুনু এখনও চা খেতে শেখেনি, কিন্তু তার লোভ চায়ের সঙ্গের খাবারগুলোর দিকে। দুখানি বিস্কুট ও একখানি জেলি-মাখানো খণ্ডরুটি পেয়ে টুনু

যখন বুঝলে আপাতত আর কোনও খাবার পাবার আশা নেই, তখন মাথার কোকড়ানো চুলগুলি দুলিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাংলোর বাগানে।

রোজ সকালে-বিকালে টুনুর খেলার জায়গা ছিল এই বাগানটি। এরই মধ্যে বসে বসে সে ধুলো-মাটি দিয়ে ঘর বানায়, লতাপাতা ছিঁড়ে রান্না করে খেলাঘরের তরকারি। তার আরও অনেক রকম খেলা আছে, সে-সবের কথা এখানে না বললেও চলবে। সেদিন টুনু বাগানের এদিকে-ওদিকে একটু ছুটোছুটি করেই দেখতে পেলে, একটা ফুলগাছের উপরে বসে আছে মস্ত একটি প্রজাপতি। কী চমৎকার তার ডানা দুটির রং রামধনুকেও অত রকম রঙের বাহার থাকে না! অতএব টুনুর আজকের খেলা হল ওই প্রজাপতিটিকে বন্দি করবার চেষ্টা।

কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না। টুনু যেই তার কাছে যায়, অমনি সে ফুস করে এ গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে গিয়ে বসে। টুনুর রোখ চেপে গেল, আজ সে ওই প্রজাপতিটিকে ধরবেই ধরবে। প্রজাপতি ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যত ওড়ে, টুনুও তার পিছনে পিছনে তত ছোটে। সে যেন এক নতুন রকম মজার চোর চোর খেলা।

প্রজাপতি উড়ছে, টুনুও হাত বাড়িয়ে ছুটছে। প্রজাপতি উড়তে উড়তে বাগানের ফটক পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল, টুনুও তার পিছু ছাড়লে না। তার দৃষ্টি আর কোনওদিকেই নেই এবং তার চোখের সুমুখ থেকে যেন মুছে গিয়েছে ওই প্রজাপতি ছাড়া পৃথিবীর আর সব দৃশ্যই। সে কোনওদিনই বাগানের ফটকের বাইরে যায় না, বাপ-মায়ের মানা আছে। কিন্তু আজ সে যে ফটকের বাইরে চলে গিয়েছে, এ খেয়ালও তার ছিল না।

প্রজাপতি উড়ে পালায়, টুনুও ছোটে পিছনে পিছনে। প্রায় মিনিট-দশ ধরে চলল এই ছুটোছুটি। রোদের তাপ লেগে টুনুর কচি মুখখানি রাঙা হয়ে

উঠল, কপালে দেখা দিলে ফোটা ফোটা ঘাম। তার ছোটো ছোটো পা দু-খনি শ্রান্ত হয়ে এল, তবু প্রজাপতির সঙ্গ ছাড়তে পারলে না।

অবশেষে একটা ঝোপের কাছে এসে প্রজাপতি হঠাৎ আকাশের দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। টুনু খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চোখ তুলে হতাশ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এবং দুষ্ট প্রজাপতির এই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখে তার নরম ঠোঁট দু-খানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দারুণ অভিমানে।

এতক্ষণ পরে তার হুস হল, সে বাগানের ফটক পেরিয়ে এসেছে। চারদিকে তাকিয়েও সে তাদের বাড়ি বা বাগান দেখতে পেল না। এখানে চারদিকেই রয়েছে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোনও দিকে তাদের বাড়ি আছে, তাও সে বুঝতে পারলে না। শেষটা আন্দাজে, একটা দিক ধরে আবার ছুটতে শুরু করলে।

কতকক্ষণ ধরে সে ছুটলে, তা সে জানে না। তবে এটুকু বুঝলে, যতই সে ছুটছে, জঙ্গল হয়ে উঠছে ততই নিবিড়। এদিকে নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি নেই।

তখন বনের কাঁটাঝোপে লেগে তার ঘাগরার নানা জায়গা গেছে ছিঁড়ে এবং পায়ে কাঁটা ফুটে বেরুচ্ছে রক্ত। টুনু আর ছুটতে পারলে না, সেইখানেই বসে পড়ে সভয়ে করুণ স্বরে কেঁদে উঠল—‘মামণি, বাবা গো!’

কিন্তু মা বা বাবার কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে চা-পানের পর খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করলে অসিত ও সুরমা। টুনু এমন সময় রোজই বাগানের ভিতরে গিয়ে খেলা করে, সুতরাং তার জন্যে তাদের কোনওই ভাবনা হল না।

তারপর সুরমা বললে, টুনু বাগানে গিয়ে কী করছে বলো তো? কালকের মতো আজও আবার ফুলগাছ ছিঁড়ছে না তো?

অসিত বললে, টুনু দিনে দিনে ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছে। তুমি একবার গিয়ে দ্যাখো তো, সে কী করছে?

সুরমা নিশ্চিন্ত ভাবেই বাগানের দিকে নেমে গেল। তার খানিক পরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে ফিরে এসে বললে, ওগো, টুনু তো বাগানের ভিতরে নেই!

অসিত বললে, 'বাগানের ভিতরে নেই! সে কী?—টুনু! টুনু ও টুনু!' ডাকাডাকির পরেও টুনুর কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না। অসিত তখন উদ্বিগ্ন মুখে বাগানের বাইরে চলে গেল দ্রুতপদে।

সুরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, অসিত খুব চেঁচিয়ে, টুনু, টুনু বলে বারবার ডাকাডাকি করছে। স্বামীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই দূরে, আরও দূরে চলে গেল, তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আর তা শোনা গেল না।

সুরমার মায়ের প্রাণ ভয়ে তখন সারা হয়ে উঠেছে। সে তো জানে, বাগানের বাইরে এই বনের ভিতরেই আছে কত রকম বিপদ-আপদ। কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

একঘণ্টা কেটে গেল, তখনও অসিত বা টুলুর দেখা নেই। নিশ্চয়ই এখনও টুনুকে পাওয়া যায়নি, নইলে এতক্ষণে তার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে আসত। নানারকম অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও অনেকক্ষণ। সুরমার দু-চোখ দিয়েই ঝরছে তখন অশ্রুজল।

আরও কতক্ষণ পরে অসিত ফিরে এল মাতালের মতো টলতে টলতে। স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখেই সুরমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে খুঁজে পাওয়া যায়নি তার বুকের নিধিকে। অসিত বারান্দায় উঠে ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল, কিন্তু কোনও কথাই কইতে পারলে না।

আশার বিরুদ্ধেও আশা করে সুরমা থেমে থেমে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, টুনুকে খুঁজে পেলে না?

না। সে বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সুরমা অজ্ঞান হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয়

বৎসহারা

সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সরোবর। মানুষের হাতে কাটা নয়, স্বাভাবিক সরোবর। গ্রীষ্মকালে জল হয় অগভীর, কিন্তু বর্ষাকালে জল ওঠে তার কুল ছাপিয়ে।

দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়। সরোবরের পূর্ব আর পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকে মস্ত একটা নতোন্নত প্রান্তর করছে ধু ধু। সরোবরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে অনেকগুলো গাছ যেন সকৌতুহলে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে নিজেদের চেহারা দেখবার জন্যে। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাতাসের দোলায় হিন্দোলিত সরোবরের জলের সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে স্নিগ্ধ ছায়ার মিষ্ট মায়া।

রোজ দুপুরবেলা রোদের ঝাঁঝে যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পৃথিবী, তখন একদল হাতি সরোবরের এই ছায়া-ঢাকা অংশটাতে জলের ভিতরে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করতে আসে। কতকাল থেকে তারা যে এই জায়গাটিতে অবগাহন-স্নান করে আসছে, সে-খবর কেউ রাখে না। কিন্তু গ্রীষ্মের যে-কোনও দুপুরে এখানে এলেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। এবং প্রতিদিনই সেই সময় এখানকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে জেগে ওঠে তাদের ঘন ঘন বৃংহিতধ্বনি। সেই ধ্বনি শুনতে পেলে কেঁদো বাঘগুলো পর্যন্ত দূর থেকেই সরে পড়ে মানে মানে।

এই সরোবরে দুপুরে স্নান করতে আসে বয়ার বা বন্য মহিষরাও। কিন্তু তারা থাকে সরোবরের অন্য দিকে, হাতিদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে। হরিণরাও এখানে আসে অনেক দূর থেকে জল পান করবার জন্যে। আবার সাঁতার কাটবার জন্যে আসে পালে পালে বালিহাসরাও। পক্ষীরাজ্যের ধীবর

জাতীয় মাছরাঙারাও থেকে থেকে গাছের ডাল ছেড়ে হঠাৎ জলের উপরে ছোঁ মেরে আবার উড়ে যায় এক-একটা রঙিন বিদ্যুতের মতো। ভণ্ড বকেরাও জলের ধারে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো ও মাছ ভোলানো তপস্যা করে। জলতেষ্টা পেলে বন্য বরাহদেরও মনে পড়ে এই সরোবরটি। আরও আসে কত জাতের জানোয়ার, সকলকার নাম বলতে গেলে বেড়ে যাবে পুঁথি। মোট কথা, এই সরোবরের চারিদিকটা হচ্ছে যেন বনবাসী জানোয়ারদের মিলনের ক্ষেত্র। তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয় না বটে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরগুলো সারাদিনই মুখর করে তোলে এই স্থানটিকে। তাদের অনেকেরই গলার আওয়াজ শুনে ও গায়ের গন্ধ পেয়ে কেঁদো বাঘ এবং আমিষের ভক্ত অন্যান্য জীবদের রসনা রীতিমতো সরস হয়ে ওঠে। কিন্তু ও অঞ্চলে দিনের বেলায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তাদের দেখলেই শিং উঁচিয়ে আর শুঁড় তুলে বয়ার এবং হাতিরা অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মোষ আর হাতিদের বাচ্চাদের বাগে পেলে কেঁদো বাঘেরা ছেড়ে কথা কয় না। সেইজন্যেই বাঘেদের উপরে এদের এত রাগ।

বাঘদের আমরা হিংস্র জীব বলি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জীব কে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে, মানুষ। সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার জীবহত্যা করে নিজেরা বাঁচবে বলে। মাংস না খেলে তাদের চলে না। কিন্তু মানুষ বনবাসী জন্তুদের বধ করে প্রায় অকারণ পুলকেই। যেসব জন্তু তাদের কোনওই অপকার করে না এবং যেসব জন্তুর মাংসও তারা খায় না, মানুষরা বধ করে তাদেরও। কিন্তু জানোয়ারদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মানুষও এই সরোবরের সন্ধান পায়নি, তাই রক্ষা! মানুষরা যদি একবার খবর পেত যে এই জায়গাটি হচ্ছে বনবাসী জন্তুদের মিলন ক্ষেত্র, তাহলে দু-দিনেই এখান থেকে লুপ্ত হয়ে যেত জানোয়ারদের এই বিপুল জনতা। না, এখানে মানুষের গন্ধ পায় না কেউ। সেদিন দুপুরেও বসেছে হাতিদের জলের আসর এবং পুরোদমে চলছে তাদের জলকেলি।

জলের ভিতরে কোনও কোনও হাতি প্রায় সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুড় দিয়ে জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে সকৌতুকে। কোনও কোনও হাতি জলের ভিতরে স্থির হয়ে বসে এক মনে উপভোগ করছে অবগাহন-মনের আরাম। কোনও কোনও হাতি সাঁতার কেটে সরোবরের মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে গা ভাসিয়ে। কয়েকটা বাচ্চা হাতি জলে নেমে অত্যন্ত দাপাদাপি করছে। কোনও কোনও হাতি থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে অতিরিক্ত আনন্দে। আমরা বলি তাকে বৃংহিত, কিন্তু হাতিদের সভায় বোধহয় সেটা সংগীত বলেই গণ্য হয়।

কেবল একটি হাতি জলে নামেনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাঁশঝাড়ের পাশেই। হাতি না বলে তাকে হস্তিনী বলাই উচিত। বাঁশের কচি পাতা হাতিদের অত্যন্ত আদরের খাবার। কিন্তু এই হস্তিনীটির লক্ষ বাঁশের পাতার দিকেও নেই। দেখলেই মনে হয়, সে যেন অতিশয় মনমরা ও বিমর্ষ হয়ে আছে। তার ছোটো ছোটো চোখদুটিও কেমন ক্লান্তি মাখানো। তা, হস্তিনীর বিমর্ষ হবার কারণও আছে। আজ দু-দিন হল, তার ছোটো বাচ্চাটি বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। বাচ্চাটির বয়স দু-মাসের বেশি নয়। খুব সম্ভব সে হয়েছে কেঁদো বাঘের খোরাক। সেই বাচ্চার শোকেই হস্তিনী হয়ে আছে আচ্ছন্নের মতো। তার স্তন দুধের ভারে টনটন করছে, কিন্তু দুধ পান করবার কেউ নেই। হঠাৎ কী-একটা শব্দ শুনে সচমকে হস্তিনীর দুই কান খাড়া হয়ে উঠল।

বনের ভিতরে দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্রন্দনধ্বনি। শিশুকণ্ঠে শোনা গেল, ওগো মামণি, মামণি গো?

বছর তিনেক আগে একবার মানুষের হাতে বন্দিনী হয়েছিল এই হস্তিনী। কিন্তু বছর দুই বন্দি অবস্থায় কাটিয়ে আবার সে পেয়েছিল পালিয়ে আসবার সুযোগ। সেই দুই বৎসরেই মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল। ওই কান্না আর কথা শুনেই হস্তিনীর বুঝতে দেরি লাগল না যে, বনের ভিতরে এসেছে একটি মানুষের শিশু ।

শিশু কণ্ঠস্বর আবার সক্রন্দনে বললে, ওগো মামণি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে!

হস্তিনীর আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারে কেটে গেল। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সে বেগে ছুটে গেল সেইদিকেই।

জঙ্গল ভেঙে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে, একটি ঝোপের ধারে মাটির উপরে বসে হাপুস চোখে কাঁদছে মানুষদের একটি ছোট্ট মেয়ে। বলা বাহুল্য, মেয়েটি হচ্ছে আমাদের টুনু।

জঙ্গলের ভিতর থেকে মস্ত বড়ো একটা হাতিকে বেরিয়ে আসতে দেখেই টুনুর তো চক্ষুস্থির! ভয়ে তার কান্না হয়ে গেল বন্ধ।

তারপর বিস্ফারিত চোখে টুনু দেখলে, হাতিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু হস্তিনী তাকে ছাড়লে না। ঝোপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে শুড় বাড়িয়ে খুব আলতো ভাবে তার দেহটি জড়িয়ে ধরলে—সঙ্গে সঙ্গে টুনুর কী পরিত্রাহি চিৎকার!

হস্তিনী টুনুকে শুড়ে করে তুলে ধরে নিজের মাথার উপরে বসিয়ে দিলে। দারুণ আতঙ্কে টুনু প্রাণপণে চিৎকার করছিল বটে, কিন্তু তখনও সে নিজের বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলেনি। হাতির শুড় তাকে ছেড়ে দিতেই সে বুঝে ফেললে যে এখনই দুম করে তার মাটির উপরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে হাতির দু-খানা কুলোর মতো কান চেপে ধরলে খুব জোরে। তারপরে আবার সে জুড়ে দিলে কান্না।

আমরা বোকা লোককে হস্তীমূর্খ বলে ডাকি বটে, কিন্তু আমাদের এই হস্তিনীটি তার হাতি-বুদ্ধিতে বুঝে নিলে যে, মানুষের এতটুকু শিশু কখনও মা ছাড়া থাকে না। তার নিজের বাচ্চার মতো এই শিশুটিও নিশ্চয় বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে এবং এখন এত কাঁদছে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যেই।

অবশ্য তাকে দেখে মেয়েটির ভয়ও হয়েছে। মানুষদের দেশে সে যখন থাকত, তখন বরাবরই দেখে এসেছে, বয়স্ক মানুষরাও তাকে দেখে পেত রীতিমতো ভয়।

হস্তিনীর মনে পড়ল নিজের বাচ্চার কথা। হয়তো এখনও সে বেঁচে আছে, হয়তো সেও এখন তারই জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে বনে বনে।

হস্তিনীর মায়ের প্রাণ এই মাতৃহারা মনুষ্য-শিশুটির জন্যে সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কী করে যে তাকে সান্তনা দেবে, এট কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলে না। হস্তিনী আবার ভাবলে, হয়তো এই শিশুটির খুব খিদে পেয়েছে। হয়তো খাবার পেলে সে একটু শান্ত হতে পারে।

কিন্তু বড়ো ফাঁপরে পড়ল সে। এ হচ্ছে মানুষের শিশু, তার নিজের বাচ্চার মতো এ তো আর হাতির স্তনের দুধ বা বাঁশগাছের পাতা খেতে পারবে না! আর এই গহন বনে মানুষের খোরাকই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

কিছুদূরে কী একটা বুনো ফলের গাছ ছিল, হঠাৎ হস্তিনীর চোখ পড়ল তার দিকে। তখনই তার মনে পড়ল, মানুষের বাচ্চাদের সে ফল খেতে দেখেছে। সে তখন মাথার উপরে টুনুকে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই ফলগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর শুড় দিয়ে একটি ফল ছিঁড়ে দিলে টুনুর কাছে। কিন্তু টুনু ফলের দিকে চেয়েও দেখলে না, সামনে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

হস্তিনী বোধহয় ভাবলে, আচ্ছা মুশকিল তো বাপু! মানুষের এই বাচ্চাটা ফলও খাবে না, কান্নাও থামাবে না! এখন একে নিয়ে কী করা যায়? এর কি জলতেষ্টা পেয়েছে? দেখি একবার সরোবরের কাছে গিয়ে!

হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে টুনুকে মাথায় করে হস্তিনী চলল সরোবরের দিকে। ওদিকে সরোবরের হাতির হস্তিনীর মাথায় টুনুকে দেখে বিপুল বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সাঁতার কাটা, খেলা, জল ছোড়াছুড়ি ভুলে

একদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাতির দল টুনুর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে।

হস্তিনীর কোনওদিকেই ভূক্ষেপ নেই, সোজা সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার শুড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে টুনুকে মাথার উপর থেকে নীচে নামাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু টুনু তখন নীচে নামবে কী! একটার উপরে আবার এতগুলো হাতি দেখে সে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল। হাতির কানদুটো আরও জোরে চেপে ধরে সে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

পাছে টুনুর কচি গায়ে লাগে, সেই ভয়ে হস্তিনী টুনুকে নিয়ে বেশি টানাটানি করতে সাহস করলে না। তার উপরে এটাও সে বুঝলে, হাতির দল দেখে টুনু আরও বেশি ভয় পেয়েছে। কাজেই টুনুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সে সরে পড়ল।

হস্তিনী অনেকক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো। এই বিপজ্জনক বনে মানুষের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না, আবার নিজের কাছে রাখাও চলে না। তার কাছে থাকলে এই মানুষের বাচ্চাটি হয়তো অনাহারেই মারা পড়বে।

আমি হাতি নই, সুতরাং হস্তিনী ঠিক কোন কথা ভাবছিল তা আন্দাজ করতে পারছি না বটে, তবে সে অনেকটা ওই রকম কিছুই যে ভাবছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তারপর ভাবতে ভাবতে বোধহয় সে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললে এবং তখনই দ্রুতপদে অগ্রসর হল অরণ্যের একদিকে।

টুনু এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বটে, কিন্তু আর চিৎকার করছে না। এতক্ষণ পরে বোধহয় তার কিছু সাহস হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই হাতিটা তার কোনও অপকার করবে না।

বনের ভিতর দিয়ে হাতি পার হয়ে গেল মাইলের পর মাইল। বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদীর তীর দিয়ে সামনে এগিয়ে চলল হস্তিনী।

টুনু ভাবতে লাগল, হাতিটা তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? তার মায়ের কাছে নাকি? এই কথা মনে হতেই টুনু হল অনেকটা আশ্বস্ত। সে কান্না থামিয়ে ফেললে। কচি কচি গলায় বললে, ‘লক্ষ্মী হাতি, সোনার হাতি, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো তো ভাই! তোমাকে আমি একঠোঙা লজেঞ্চুস খেতে দেব।’

হস্তিনী টুনুর কথার মানে বুঝতে না পারুক, কিন্তু সে যে কান্না থামিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এইটুকু বুঝেই ভারী খুশি হয়ে উঠল। তাই চলতে চলতে মাঝে মাঝে টুনুর গায়ে আদর করে শুড় বুলিয়ে দিতে লাগল।

বৈকালের মুখে হস্তিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি হচ্ছে কাঠুরেদের একটি ছোট্ট গ্রামের মতো। কাঠুরেরা তখনও বন থেকে ফেরেনি। কাঠুরে-বউরা নিজের নিজের ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি ঘরের দাওয়ায় বসে খুন্তিনেড়ে রান্না করছিল একটি কাঠুরে-বউ। নাম তার পার্বতী।

বাইরের দিকে পিছন করে খুন্তি নাড়তে নাড়তে পার্বতী হঠাৎ সচমকে দেখলে, ঠিক তার পাশেই চাল থেকে যেন মাটির উপরে খসে পড়ল ছোট্ট একটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে। তারপরেই ফিরে বসে দেখলে, দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা হাতি। দেখেই সে খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে হাউ-মাউ করে ঘরের ভিতরে দিলে ছুট।

টুনু মাটির উপর বসে বসে দেখলে, হাতিটা আস্তে আস্তে আবার বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে মাঝে মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তারপরে বনের ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানোয়ারের পিঠ ছেড়ে মানুষের ঘরে এসে টুনু কতকটা আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু এখনও মায়ের দেখা না পেয়ে তার ভারী মন কেমন করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পার্বতী জানলার উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে, সে মস্ত হাতিটা আর সেখানে নেই। তখন সে আস্তে আস্তে বাইরে এসে কৌতুহলী চোখে টুনুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে এত সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখেনি। যেমন তুলি দিয়ে আঁকা নাক মুখ চোখ, তেমনি দুধে-আলতায় গায়ের রং। আর গড়নটিও সুডৌল। দেখলেই আদর করতে আর ভালোবাসতে সাধ হয়। হাতির মাথায় চড়ে এল যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও রাজা-মহারাজার মেয়ে হবে।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলে, ‘তুমি কে, খুকুরানি?’

টুনু বললে, আমি টুনু।

তুমি কোথায় থাকো?

‘বাড়িতে।’

‘তোমার বাবা বুঝি রাজা?’

'না, তিনি বাবা।’

‘তোমার মা আছেন?’

‘হু-উ-উ-উ ।’

‘তোমার সঙ্গে লোকজনরা কোথায়?’

টুনু এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলে না। সে এগিয়ে গিয়ে নিজের ছোটো ছোটো হাত দু-খানি দিয়ে পার্বতীর কাপড় ধরে টানতে টানতে বললে, ‘আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো। নইলে আমি কেঁদে ফেলব!’

পার্বতী বললে, ‘তোমার মা কোথায় থাকেন, খুকুমণি?’

‘বাড়িতে।’

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’

‘জানি না।’

‘তবে আমি কেমন করে তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব?’

টুনু বললে, ‘প্রজাপতিটা ধরা দিলে না। ছাই প্রজাপতি, দুষ্টু প্রজাপতি। সে পালিয়ে গেল, আমি হারিয়ে গেলুম। ওই লক্ষ্মী হাতিটা আমাকে মাথায় করে এখানে নিয়ে এসেছে। ভারী লক্ষ্মী, আমাকে একবারও বকেনি।’

এতক্ষণে পার্বতী ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলে এ কোনও অভাগীর চোখের মণি, হারিয়ে গিয়েছে বনের কোথায়, একে কুড়িয়ে পেয়েছে বনের হাতি। এমন আশ্চর্য কথা পার্বতী আর কখনও শোনেনি।

টুনু ছলছলে চোখে বললে, ‘আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও, নইলে আমি কাদব!’

সত্য, টুনু যে ক্ষুধার্ত, সেটা তার শুকনো মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ কোনও বড়ো ঘরের মেয়ে, বাড়িতে কত ভালো ভালো খাবার খায়, গরিব কাঠুরে-বাড়ির খাবারে তার রুচি হবে কি? এই ভাবতে ভাবতে পার্বতী বললে, টুনু, তুমি কী কী খাবার খাও?

উত্তরে টুনু এক নিশ্বাসে খুব লম্বা একটা খাবারের ফর্দ দাখিল করলে।

পার্বতী হেসে বললে, আমাদের তো ওসব খাবার নেই!

টুনু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, তবে আমি কাঁদি?

পার্বতী ব্যস্ত হয়ে বললে, না খুকু, কেঁদো না। তুমি রুটি খাবে? রুটি আর গুড়?

টুনু তক্ষুনি উৎসাহিত হয়ে বললে, ‘পাটালিগুড় তো?’

দৈবক্রমে পার্বতীর ঘরে সেদিন পাটালিগুড় ছিল। সে তখনই একখানি সানকিতে দুখানি রুটি আর পাটালিগুড় টুনুর সামনে ধরলে।

টুনু সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এতটুকু মেয়ে কি এতক্ষণ উপোস করে থাকতে পারে? দারুণ শোকে, ভয়ে আর

দুর্ভাবনায় তার মন এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বলেই ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সানকির উপর থেকে দু-খানি মাত্র রুটি আর একখণ্ড পাটালি অদৃশ্য হতে আর দেরি লাগল না। তারপর টুনু বললে, আরও রুটি খাব, আরও গুড় খাব।

পার্বতী তাকে আরও দু-খানি রুটি আর একখানি পাটালি এনে দিলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে টুনু হাই তুলে বললে, আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোব।'

পার্বতী তাকে নিজের কোলের উপরে তুলে নিলে। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে টুনুর দুই চোখ গেল মিলিয়ে।

সন্ধ্যার সময় দুখিরাম ফিরে এল। সে হচ্ছে পার্বতীর স্বামী।

বিছানার উপরে শুয়ে টুনু ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে দুখিরাম বললে, এ আবার কে রে পার্বতী?

পার্বতী হাসতে হাসতে বললে, আমাদের তো ছেলেপুলে নেই, ভগবান তাই দয়া করে এই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুখিরাম আরও আশ্চর্য হয়ে বললে, ভগবান মেয়ে পাঠিয়েছে কী রে? ও কার মেয়ে? কে ওকে এখানে নিয়ে এল?

ও কার মেয়ে তা জানি না, তবে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে একটা হাতি।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে দুখিরাম বললে, হাতি!

হ্যাঁ, একটা বনের হাতি।

বনের হাতি নিয়ে এল মানুষের মেয়ে? তা কখনও হয়?

তা হয় না বলেই তো বলছি, এসব ভগবানেরই লীলে।

এইবারে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে দুখিরাম ঘাড় নেড়ে বললে, তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কি আমার সঙ্গে মস্করা করছিস?

মশকরা নয় গো, মশকরা নয়। তবে শোনো।

পার্বতী তখন একে একে সব কথা স্বামীর কাছে খুলে বললে।

সব শুনে দুখিরাম খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চিন্তিত মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, এ যে বড়ো ভাবনার কথা হল রে!

পার্বতী বললে, কেন?

কেন তা বুঝতে পারছিস না? শেষটা কি মেয়ে চুরি করেছি বলে জেল খাটতে যাব? আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি বলি মেয়ে পেয়েছি হাতির কাছ থেকে, তাহলে জজ কি সে কথা মানবে? এ বড়ো বিপদের কথা রে পার্বতী, ভারী বিপদের কথা!

পার্বতী বললে, দ্যাখো, তুমি এক কাজ করো। মেয়ে আপাতত আমাদের কাছেই থাক। তুমি বরং থানায় গিয়ে একটি খবর দিয়ে এসো। তাহলেই তোমার উপর আর কোনও ঝুক্কি পড়বে না। তারপর মেয়ের বাপ মেয়ে ফিরিয়ে নিতে আসে, ফিরিয়ে দেব। না আসে, মেয়ে আমাদের কাছেই থাকবে। মা দুগ্গা করুন, মেয়ের মা-বাপ যেন কোনও খবর না পায়!

দুখিরাম বিরক্ত স্বরে বললে, ছিঃ পার্বতী, অমন কথা মুখেও আনিসনি। একবার ভেবে দেখ দেখি, মেয়ের মা-বাপের কথা। তাদের বুকের ভিতরটা এখন কী করছে, তা কি বুঝতে পারছিস না? হে মা দুগ্গা, পার্বতীর কোনও অপরাধ নিয়ো না মা, ও না বুঝে অমন পাপ কথা বলে ফেলেছে।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই টুনু কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরলে, তাকে এখনই মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবেই হবে।

পার্বতী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাবার-দাবার দিয়ে কোনওরকমে তার মুখ বন্ধ করলে। টুনু খাবার খেতে লাগল ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতেই।

ছোট্ট গাঁ, টুনুর কথা রাষ্ট্র হতে দেরি লাগেনি। সকালে গাঁয়ের যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এল টুনুকে দেখতে।

বেশ একটি ছোটোখাটাে জনতা। খোকাখুকি থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই এসে চারিদিক থেকে টুনুকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলে মিলে সবিস্ময়ে টুনু সম্বন্ধে যখন মতামত প্রকাশ করছে, তখন বনের ওদিক থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বললে, পালাও—পালাও—পাগলা হাতি, পাগলা হাতি।

সবাই সভয়ে ফিরে দেখে, বনের ভিতর থেকে বিরাট দেহ নিয়ে হেলতে হেলতে ও দুলতে দুলতে বেরিয়ে আসছে কালকের সেই হস্তিনী। তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। এমনকি, পার্বতী ও দুখিরাম পর্যন্ত ভয়ে প্রায় বেহুঁস হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলে দরজায়।

সেখানে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল কেবল টুনু।

ঘরের ভিতরে ঢুকে পার্বতীর হুঁস হল। সে বলে উঠল, ওই যাঃ, টুনু যে বাইরে!

দুখিরাম বললে, কী করব বল পার্বতী?

পাগলা হাতির সামনে বেরুব কেমন করে? পার্বতী তাড়াতাড়ি আবার দরজার খিল খুলতে গেল, কিন্তু দুখিরাম তার হাতদুটো চেপে ধরে বললে, করিস কী, শেষটা কি অপঘাতে মারা পড়বি? আচ্ছা দাঁড়া, জানলা একটু ফাঁক করে দেখি, বাইরে কী ব্যাপার হচ্ছে!

দুখিরাম জানলার কাছে গেল। একখানা পাল্লা একটু খুলে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলে, কিন্তু বাইরে কারুকেই দেখতে পেলে না। না টুনু, না হাতি। সে সবিস্ময়ে বললে, ওরে পার্বতী, সর্বনাশ হয়েছে যে, পাগলা হাতিটা টুলুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে?

পার্বতী দরজা খুলে বেগে বাইরে ছুটে গেল। কিন্তু সে-ও টুনু বা হাতি কারুকেই দেখতে পেলে না। টুনু, টুনু বলে চেঁচিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলে, কিন্তু টুনুর কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। সে তখন কাঁদো কাঁদো মুখে ধপ করে মাটির উপরে বসে পড়ল। দুখিরাম তাকে সাত্ত্বনা দিয়ে বললে, ভগবান

দিয়েছিল, ভগবানই কেড়ে নিলে। আমাদের ঘরে কি ও মেয়ে মানায়? কী আর করবি পার্বতী, দুখু করে আর কোনও লাভ নেই। নে, এখন ওঠ, দুটা‍ে পান্তাভাত দে, আমাকে আবার কাজে যেতে হবে।

পার্বতী চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে স্বামী-আদেশ পালন করতে গেল ।

খেয়ে-দেয়ে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল দুখিরাম। পার্বতীও কলশি নিয়ে নদীতে জল আনতে গেল।

তারপর ঘণ্টা-দুই কেটে গেছে। পার্বতী যন্ত্রে-চলা পুতুলের মতন ঘরকন্নার কাজ করছে বটে, কিন্তু মুখ তার ম্রিয়মাণ। মনে মনে খালি সে ভাবছে, এক দিন টুনুকে পেয়ে মায়ার টানে তার জন্যে মন কাঁদছে, আর যারা টুনুর বাপ-মা, এমন মেয়ে হারিয়ে না-জানি তাদের কী হালই হয়েছে!

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল কচি শিশুকণ্ঠের কৌতুক হাস্য। পার্বতী চমকে উঠল। এক ছুটে সে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, সেই হাতিটা আবার দুলতে দুলতে তাদের ঘরের দিকেই আসছে, আর—তার মাথার উপরে দুই হাতে হাতির দুই কান চেপে ধরে সকৌতুকে হেসে হেসে উঠছে টুনু।

পার্বতী ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতি দাওয়ার সামনে এসে শুড় তুলে টুনুকে ধরে আবার মাটির উপরে নামিয়ে দিলে। তারপর ফিরে চলল বনের দিকে।

টুনু চেঁচিয়ে বললে, রুনু, রুনু!

হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে তাকালে। টুনু বললে, রুনু কাল আবার এসো, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

হাতি চলে গেল।

পার্বতী তখন ছুটে এসে টুনুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে টুনু?

টুনু গম্ভীর ভাবে বললে, বেড়াতে।

ওই হাতিটার নাম কি রুনু?

হ্যাঁ।

তুমি কেমন করে জানলে?

টুনু বললে, বা রে, আমি আবার জানব না? আমি তো আজকেই ওর নাম রেখেছি রুনু!

ও! তাই নাকি? কিন্তু টুনু, অত বড়ো একটা পাগলা হাতির সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করল না?

কে বললে আমার রুনু পাগলা? রুনু ভারী লক্ষ্মী। ওর সঙ্গে যেতে আমার ভয় করবে কেন? ও যে আমাকে ভালোবাসে। আমি এখন রোজ ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব।

পার্বতী বললে, ওর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যাবে? বাপ-মার কাছে যাবে না?

টুনু ভুরু কুঁচকে বললে, হ্যাট, তুমি ভারী বোকা, কিছু বোঝে না। আমি মায়ের কাছে গেলে, রুনুও তো আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমার মা তাকে কত আদর করবেন, কত খাবার খেতে দেবেন! রুনুকে আমি সেসব কথা বলেছি।

সে তোমার কথা বুঝতে পারলে?

কেন পারবে না? তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ, আর আমার রুনু পারবে না?

পার্বতী হাসতে হাসতে টুনুর গালে একটি চুমু খেলে।

টুনু বললে, খিদে পেয়েছে, খাবার দাও?

পার্বতী হাড়ির ভিতর থেকে দু-মুঠো মুড়কি বার করে টুনুকে খেতে দিয়ে বললে, এখন এই খাও, একটু পরে ভাত খেতে দেব।

তৃতীয়

রুনু আর টুনু

টুনুর দেখাদেখি হস্তিনীকে আমরাও এবার থেকে রুনু বলেই ডাকব। অমন মস্ত জীবের এমন ছোট্ট নাম যদিও মানায় না, তবু কী আর করি বলো, ওকে অন্য নামে ডাকলে হয়তো খুব রাগ করবে টুনু।

তারপর থেকে দিনে অন্তত একবার করেও টুনুকে না দেখলে রুনুর চলত না। টুনুকে পেয়ে সে বোধহয় নিজের হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চার দুঃখ কতকটা ভুলতে পারলে।

টুনু এখন হাতির মাথায় চড়তে খুব ওস্তাদ হয়ে পড়েছে। রুনু যখন শুড় দিয়ে তাকে টেনে তোলে, তার মনে ভয় হয় না একটুও। ঘোড়সওয়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে যেমন চালনা করে, টুনুও যেন তেমনি ভাবেই হাতির কান ধরে তাকে এদিকে-ওদিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াত। রুনু যেদিকে যাচ্ছে টুনুর সেদিকে যাবার ইচ্ছে না হলে সে দুই কানে জোরে টান মেরে চেঁচিয়ে উঠত, এই দুষ্টু রুনু, কে তোমাকে ওদিকে যেতে বলেছে? এইদিকে চলো। রুনুও অমনি পরম শান্ত ভাবেই অন্য দিকে ফিরে টুনুর মন রাখবার চেষ্টা করত।

যাঁরা হাতি পুষেছেন তাঁরাই জানেন, হাতিদের মতো বুদ্ধিমান জীব জানোয়ারদের ভিতরে খুব কম আছে। এমনকি, মানুষের অনেক কথাই তারা বেশ বুঝতে পারে। যারা কুকুর ভালোবাসেন, তারা জানেন যে মানুষের ভাষা কুকুরের পক্ষে খুব দুর্বোধ নয়। মানুষের ছোটো ছোটো অনেক কথার মানে তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে। হাতি আবার কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান জীব। আগেই বলেছি, রুনু কিছুকাল মনুষ্যসমাজে বন্দি জীবন যাপন করেছিল। সেই সময়েই মানুষের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হয়েছিল তার অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতা।

বনের স্থানে স্থানে নানা ফলের গাছে ফলে থাকত রকমারি ফল। টুনু যখন কোনও পছন্দসই ফল খাবার আবদার ধরত রুনুর তা বুঝতে বিলম্ব হত না একটুও। সে তখনই শুড় দিয়ে ফল পেড়ে এগিয়ে দিত টুনুর কাছে।

একদিন একটা বেলগাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে টুনুর বেল খাবার সাধ হল। কিন্তু রুনু জানত, বেলের উপরে থাকে শক্ত আবরণ, বেল পেড়ে দিলেই টুনু খেতে পারবে না। তাই সে বেলটা পেড়ে শুড় দিয়েই মাটির উপরে আছড়ে মেরে আগে ভেঙে ফেললে, তারপর তুলে দিলে টুনুর হাতে।

কেবল ফল নয়, টুনুর জন্যে তাকে রোজ নিয়মিত ভাবেই ফুল পর্যন্ত সংগ্রহ করতে হত। এইসব ফরমাস যে সে খুব খুশি মনেই খাটত, তার শান্ত ও উজ্জ্বল চোখদুটো দেখলেই সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যেত। সবাই জানে, জানোয়ারেরা হাসতে পারে না। কিন্তু জানোয়ারেরা যে খুশি হলে মনে মনে হাসে না, জোর করে বলা যায় না এমন কথাও। হয়তো তারা হাসে অন্য রকম উপায়ে। ওই যে খুশি হলে কুকুরেরা ল্যাজ নাড়ে, হয়তো ওইটেই তাদের হাসবার ধরন। হাতিদের হাসবার ধরনটা কী রকম, আমরা তা জানি না।

কিন্তু টুনুর নানান রকম ছেলেমানুষি দেখে রুনু যে খুব হাসত, এটুকু আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

রুনুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে টুনুর ভারী ভালো লাগত। ভালো লাগবারই কথা। এখানকার দৃশ্য যে চমৎকার! পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা, নদী, সরোবর, তেপান্তরের মাঠ ও ফুল-ফোটা সবুজ বন—এখানে কিছুরই অভাব নেই।

একদিন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে টুনুর শখ হল, সে পাহাড়ে চড়বে। বললে, রুনু, আমি পাহাড়ের উপরে উঠব।

প্রথমটা রুনু তার কথা বুঝতে পারলে না; যেমন চলছিল, মাঠ দিয়ে তেমনি ভাবেই চলতে লাগল।

টুনু তখন রাগ করে তার ছোট্ট ডান হাতখানি দিয়ে রুনুর মাথায় একটি চড় মেরে বললে, তুমি হচ্ছ ভারী হাঁদারাম! বুঝতে পারছ না, আমি ওই পাহাড়টার উপরে উঠব? বলেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে পাহাড়টাকে দেখিয়ে দিলে।

তখন রুনু তার মনের ভাবটা ধরতে পারলে। কিন্তু বুঝেও সে এমন ভাব দেখালে যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ সে জানে, টুনুকে নিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠা নিরাপদ নয়। অতএব টুনুর রাগ আর অভিমানের কোনওই ফল হল না, রুনু নিজের মনেই চলতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে।

টুনুকে নিয়ে রুনু একদিন হাজির হল আবার সেই সরোবরের ধারে। সেদিনও সরোবরের হাতিরা প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর কয়েকটি হাতি ডাঙার উপরে উঠে আসল,—রহস্যটা কী, বোধহয় সেই তদারকই করতে এল।

তাদের দেখে আজ কিন্তু টুনুর একটুও ভয় হল না। বোধহয় তার ধারণা হয়েছে, সব হাতিই রুনুর মতই শান্ত।

দু-তিনটে ফচকে বাচ্চা-হাতি ছুটে এসে রুনুর চারিদিক বেড়ে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, তারাও যেন টুনুর সঙ্গে খেলা করতে চায়।

টুনুও সকৌতুকে বলে উঠল, ও রুনু, আমাকে একটু নামিয়ে দাও না! রুনু কিন্তু তার কথা শুনলে না। উলটে এমন চিৎকার করে উঠল যে, বাচ্চা হাতিগুলো ভয় পেয়ে আবার নিজের নিজের মায়ের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। বোধহয় সে তাদের ধমক দিলে।

বড়ো বড়ো যে হাতিগুলো তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও বুঝতে পারলে, রুনুর ইচ্ছে নয় আর কেউ তাদের কাছে যায়। তখন তারাও ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জলের ভিতরে নামতে লাগল।

কাঠুরেদের গ্রামে এখন আর সকলেও রুনুকে দেখে একটুও ভয় পায় না; সে যেন তাদেরও পোষ-মানা জীব হয়ে পড়েছে। রোজই কেউ না কেউ তাকে এটা-ওটা-সেটা খেতে দেয়। বিশেষ করে পার্বতী। রুনুর জন্যে প্রতিদিনই রেখে দিত কিছু না কিছু খাবার। টুনুর হুকুমে রুনুও প্রায়ই তাদের সংসারের জন্যে নানান রকম ফলমূল সংগ্রহ করে আনত।

আর রুনুর দেখা পেলে গায়ের শিশুমহলে উঠত আনন্দের কলকোলাহল। তারাও সবাই কাছে ছুটে এসে আনন্দে খুব লাফালাফি আর চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিত। এবং টুনুর মন রাখবার জন্যে তাদের অনেককে মাথায় নিয়ে রুনুকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসতে হত।

এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পার্বতীর মনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা, কখন টুনুর বাপমা খবর পেয়ে এসে তাদের কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। টুনুকে দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হতেও পার্বতীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে যেন একেবারে তাদেরই মেয়ে হয়ে পড়েছে।

কিন্তু পার্বতীর সৌভাগ্যক্রমে টুনুর বাপ-মায়ের কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

চতুর্থ

হস্তী-কাহিনি

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। পার্বতীর সকল দুশ্চিন্তা অমূলক, কারণ টুনুর বাপ-মা কেউ এল না তাকে নিজের মেয়ে বলে দাবি করতে। তাদের ঘরেই টুনু বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। সে-ও দেখতে লাগল দুখিরাম ও পার্বতীকে বাপ-মায়ের মতোই। নিজের বাপ-মায়ের কথাও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়, কিন্তু সে যেন অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো।

রুনুরও নিয়মিত আনাগোনা বন্ধ হল না।

রুনু আর টুনু, দুখিরাম আর পার্বতী, নিজেদের সুখ-দুখ নিয়ে বাস করতে থাকুক এই বনগ্রামে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছে হাতিদের কয়েকটি গল্প বলে নিই। কিন্তু মনে রেখো, এগুলি বানানো গল্প নয়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে একেবারে সত্য কাহিনি। এগুলি শুনলে হাতিদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমরা একটা ধারণা করতে পারবে।

সিংহকে সবাই আমরা পশুরাজ বলে ডাকি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, ওই উপাধিটি হাতিরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। বনের আর সব পশুর চেয়ে হাতিরা আকারে ঢের বেশি বড়ো বলেই আমি এ কথা বলছি না; তার চাল-চলন সবই রাজকীয়। এবং এইজন্যেই বোধহয় স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা হাতির সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখে এসেছেন। হাতি কেবল হিন্দুদের স্বর্গেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হয়নি, মর্তেও আজ পর্যন্ত প্রত্যেক রাজাই হাতিকে রাজৈশ্বর্যের একটি প্রধান সম্পদ বলেই মনে করেন। হাতি বুদ্ধিমান জীব বলেই হণেশ-ঠাকুরের মুখের আকার হয়েছে হাতির মতো। হাতিরা মানুষের ভাষা (অর্থাৎ মানুষ তাদের জন্যে যে-ভাষা সৃষ্টি করেছে) বেশ বুঝতে পারে। অবশ্য সেই ভাষার শব্দসংখ্যা বেশি নয়—আঠারো-উনিশটি মাত্র।

ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে বড়ো বড়ো কাঠের গুড়ি তোলবার জন্যে হাতিদের নিযুক্ত করা হয়। সে-সব জায়গায় হাতিদের কার্যকলাপ লক্ষ করলেই বোঝা যায় তাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। মাহুত না থাকলেও খুব ভারী ভার কাঠের গুড়ি তোলবার সময় তারা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে। কোনও গাছের গুড়ি যদি খুব বেশি ভারী হয়, তাহলে একসঙ্গে তিন-চারটে হাতি মিলে সেই গুড়ি তুলে বহন করে যথাস্থানে গিয়ে রেখে আসে।

গভীর অরণ্যে দেখা গিয়েছে, দরকার হলে অশিক্ষিত বন্য হস্তীরাও এই রকম মিলে মিশে কাজ করতে পারে। হয়তো একটা গাছের কচি ডালপালা দেখে তাদের লোভ হল। কিন্তু সে-গাছটা এত বড়ো আর উঁচু যে, তাকে উপরে ফেলা একটা হাতির কর্ম নয়। তখন সেই গাছ উৎপাটন করবার জন্যে একসঙ্গে কাজ করে কয়েকটা হাতি। তাদের কেউ কেউ শুড় দিয়ে গুড়ির ডাল জড়িয়ে ধরে টানাটানি করতে থাকে এবং কেউ কেউ বড়ো বড়ো দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের মূলদেশে আঘাত করতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের মাদুরার বিখ্যাত মন্দির দেখবার জন্যে গিয়েছিলেন এক সাহেব। সেখানে মন্দিরের নিজস্ব কতকগুলি হাতি আছে, তাদের শেখানো হয়েছে ভিক্ষা করতে। সাহেবকে দেখেই তারা একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ে শুড় তুলে সেলাম করলে।

সাহেব কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেলেন।

মাহুত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, হুজুর, হাতিরা আপনাকে সেলাম করছে। ওরা কিছু বকশিশ চায়।

সাহেব হাসতে হাসতে হাতিদের সামনে একটা দু-আনি ফেলে দিলেন। কী! এতগুলো হাতির জন্যে এই তুচ্ছ একটা দু-আনি? হাতিরা গেল খেপে। তারা তখনই সাহেবের মাথার উপরে শুণ্ড আস্ফালন করতে করতে একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল।

বিপদ দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি সেখানে আরও কয়েকটা দু-আনি ছড়িয়ে দিয়ে তবেই মুক্তিলাভ করেন।

রেঙ্গুনে খুব প্রকাণ্ড একটি কাঠের গোলায় আর একটি হাতির অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও একটি মাহুতের অধীনে হাতিরা বড়ো বড়ো গাছের গুড়ি গোলার ভিতরে এনে রাখছিল। সব গুড়ি তোলা হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে কেবল একটি। একটি হাতি সেই গুড়িটা তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল, এটা হচ্ছে ছুটির ঘণ্টা। এই ঘণ্টাধ্বনি হবার পরেই গোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। মাহুত শেষ যে গাছের গুড়িটা পড়ে ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি তুলে আনবার জন্যে হাতিকে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু হাতির ভাব দেখে মনে হল, গুড়িটা অত্যন্ত ভারী বলে সে অনেক চেষ্টা করেও সেটা তুলতে পারছে না। মাহুত তখন বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে গোলার বাইরে চলে গেল।

পরদিন যথাসময়ে আবার গোলার কাজ আরম্ভ হল। মাহুত সেই হাতিটাকে ভিতরে নিয়ে এসে আবার কালকের ফেলে যাওয়া গুড়িটা তুলে নিয়ে যেতে বললে। হাতি এগিয়ে গিয়ে খুব সহজেই দুই দন্তের সাহায্যে গাছের গুড়িটা মাটি থেকে তুলে অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়ে রেখে এল।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই। হাতি কালকে ইচ্ছা করেই গুড়িটা তোলেনি, কারণ তখন বেজে গিয়েছে ছুটির ঘণ্টা। তবু সে যে বার বার গুড়িটা তোলবার চেষ্টা করেও অক্ষম হয়েছিল, আসলে তা হচ্ছে লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

চার্লস মেয়ার সাহেব একটি হাতির গল্প বলেছেন।

মালয় দেশে সাহেবের একটি পশুশালা ছিল। সেই পশুশালার একটা হাতি একদিন গেল খেপে। হাতিরা মাঝে মাঝে এই রকম খ্যাপামি অসুখে ভোগে। সাত-আট দিন বাদে আবার তাদের মাথা ঠান্ডা হয়।

মেয়ার সাহেব তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে তখনই একটা লম্বা হুক নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলেন। তারপর হুক দিয়ে বার বার তার পেটের এক জায়গায় মারতে লাগলেন খোঁচা। বেগতিক দেখে হাতিটা তার ক্ষতস্থানটা ঢেকে ফেলবার জন্যে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সে আর কোনও গোলমাল করলে না। তারই কিছুদিন পরে অষ্ট্রেলিয়ার এক পশুশালার অধ্যক্ষ সেই হাতিটাকে কিনে নিয়ে গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে মেয়ার সাহেবও অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হন। তার সেই হাতিটা সিডনি শহরের পশুশালায় আছে শুনে একদিন কৌতুহলী হয়ে তিনি তাকে দেখতে গেলেন। হাতির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না সে তাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তার পেটের উপরে সেই পুরাতন ক্ষতের শুষ্ক চিহ্নটা তখনও বর্তমান ছিল। মেয়ার সাহেব আস্তে আস্তে সেই চিহ্নটার উপরে হাত দিলেন। হাতিটা অমনি একটা গম্ভীর শব্দ করে সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্যে ধপাস করে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। সাহেবকে সে চিনতে পেরেছিল। তিনি তার পেটে হাত দিতেই তার ভয় হয়েছিল, আবার বুঝি সেখানে হুকের নতুন খোঁচা খেতে হয়।

মেয়ার সাহেব তারপর তাকে মিষ্টি খাইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তখন সে আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলাতে হাতির দ্বারা গৃহস্থলির অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। একটা হাতি শুড় দিয়ে ঝাঁটা ধরে বাড়ির নানান জায়গা প্রতিদিন সাফ করে দিত। আফ্রিকার এক জায়গায় একরকম বামন হাতি পাওয়া যায়। সেখানে কেউ কেউ ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার গাড়িতে বামন হাতিদের ব্যবহার করে থাকে।

লন্ডনের পশুশালার একটা হাতির গল্প শোনো।

একদিন সে নিজের রেলিং-ঘেরা জায়গাটির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এল দুইজন সৈনিক। পশুশালার অনেক দর্শক জীবদের খাবার খেতে দেয়,

এই সৈনিকদুটিরও হাতে ছিল খাবার। তারা রেলিঙের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ধরলে হাতির সামনে। কিন্তু হাতি যেই মুখ বাড়িয়ে খাবার খেতে গেল, অমনি তারা চট করে হাত সরিয়ে নিলে। এই ব্যাপার চলল কয়েক মিনিট ধরে।

হাতি তখন বুঝলে, তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে তখন সৈনিকদের দিকে পিছন ফিরে চলে গেল, যেখানে তার পানীয় জল থাকে সেইখানে। তারপর শুড় দিয়ে অনেকটা জল শোষণ করে আবার সে ফিরে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। সৈনিকরা তখনও অপেক্ষা করছিল, হাতি কাছে আসতেই আবার তাকে খাবারের লোভ দেখালে। হঠাৎ হাতির শুড়টা উঠল উপর দিকে, এবং পরমুহুর্তেই শুড়ের ভিতর থেকে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে এসে সৈনিকদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ভিজিয়ে দিলে।

সেখানে আরও যেসব দর্শক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেই বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল এবং সৈনিকরাও চম্পট দিতে দেরি করলে না। সেই সময় হাতিটার ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিশোধ নিয়ে সে হয়েছে বেজায় খুশি।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ দিয়ে আমি একবার দাঁতন স্টেশনে নেমে আমার এক ধনী বন্ধুর অতিথি হয়েছিলুম। তারও একটি হাতি ছিল, সে পুকুরের জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে গা ভাসিয়ে থাকতে ভালোবাসত। সে-সময়টায় সে কারুরই তোয়াক্কা রাখতে চাইত না, এমনকি সে থোড়াই কেয়ার করত তার মাহুতকেও। সে হয়তো মাঝ-পুকুরে গিয়ে আপন মনে অবগাহন-সুখ উপভোগ করছে, এমন সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে মাহুত করতে লাগল ডাকাডাকি হাকাহাকি। প্রথমটা সে কিছু বলত না, কিন্তু বারংবার ডেকে তাকে বেশি বিরক্ত করলেই সে হঠাৎ শুড় তুলে পিচকিরির মতো জল ছুড়ে মাহুতকেও একেবারে স্নান করিয়ে দিত। ছোট ছোট ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি করে অন্য ছেলের গায়ে কুলকুচো করে জল দেয় ,এও ঠিক তেমনি। হাতিটার লক্ষও ছিল অব্যর্থ, মাহুত পালাবার পথ খুঁজে পেত না।

একাধিক শিকারি বন্য হস্তীদের একটি আশ্চর্য স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শিকারির গুলিতে আহত হয়ে যদি কোনও হাতি মাটিতে পড়ে গিয়ে আর উঠতে না পারে, তখন আরও তিন-চারটে হাতি নানা দিক থেকে তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়ায়। তারপরে সকলে মিলে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দু-দিক থেকে নিজেদের গা দিয়ে সেই আহত জীবটিকে এমন ভাবে চেপে দাঁড়ায় যে, সে আর অবশ হয়ে মাটির উপরে পড়ে যেতে পারে না। তারপর সেই অবস্থায় তারা তাকে ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় উপস্থিত হয়।

মস্ত দেহের তুলনায় হাতিদের চোখ খুব ছোটো এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিও বেশ দুর্বল। বেশিদূর পর্যন্ত তাদের নজর চলে না। কিন্তু এই অভাবটা তারা পূরণ করে নিয়েছে আপন আপন প্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির দ্বারা। যেদিক দিয়ে বাতাস আসছে সেইদিকে অনেক দূরেও যদি কোনও মানুষ দাঁড়ায়, হাতিরা তার গায়ের গন্ধ পায়। পরমুহূর্তেই তারা হয় সেখান থেকে সরে পড়ে, নয় তেড়ে এসে মানুষকে করে আক্রমণ।

বনের ভিতর জলাশয়ে রাত্রেও তারা জলপান করতে যায়। কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে সন্দেহ হলে হাতিরাও হয়ে ওঠে অত্যন্ত সাবধানী। হাতির দল তখন জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং তাদের অগ্রদূতের মতো এগিয়ে আসে একটা হাতি। অন্ধকারে নীরবে ঠিক ছায়ার মতো সেই হাতিটা খানিকটা এগিয়ে এসে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এদিকে-ওদিকে শুড়ের ডগা ফিরিয়ে সে পরীক্ষা করে, বাতাসে কোনও মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় কি না। তারপর নিকটে কোথাও মানুষ নেই এটা বুঝতে পারলেই নিজের শুড়টাকে সে ভেঁপুতে পরিণত করে আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনলেই দূর থেকে অন্যান্য আওয়াজ করে উত্তর দেয়। প্রথম হাতিটা আবার আওয়াজ করে, যেন জানিয়ে দেয় যে মাভৈঃ! তখন দলের

অন্যান্য হাতিরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এসে জলপান করে, বা জলের ভিতরে লাফিয়ে পড়ে খেলা করতে থাকে। হাতির এই শুড়ের আওয়াজের আরও অনেক অর্থ আছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও হাতি বনের ভিতরে হারিয়ে গেলেও তারা বিশেষ এক সুরে এই শুড়ের ভেঁপুই বাজাতে থাকে। হারা হাতিটাও দূর থেকে সেই আহ্বান-ধ্বনি বুঝতে পেরে তেমনি করেই উত্তর দেয় এবং ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে দলের ভিতরে ফিরে আসতে ভুল করে না।

একবার একটি হাতির বাচ্চাকে বালতি করে ইদারা থেকে জল তুলে আনতে শেখানো হয়েছিল। ইদারাটা আকারে খুব বড়ো। বাচ্চা হাতিটা শুড় দিয়ে বালতি ধরে ইদারার ধারে গিয়ে জল তুলে আনত।

একদিন একটা বড়ো হাতি তার সঙ্গেই ইদারার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বড়ো হাতিটা তার জল তোলা দেখে বোধহয় ভাবলে,—বাঃ, জল তোলার এই উপায়টা তো ভারী সহজ! তারপর বাচ্চা হাতিটা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে সে অমনি তার বালতিটাকে চুরি করে ইদারার ভিতরে নামিয়ে দিলে।

বাচ্চা হাতিটা মনে মনে রীতিমতো খেপে গেল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলে না মনের ভাব। সে করলে কী জানো? বড়ো হাতিটা যখন ইদারার ভিতর হুমড়ি খেয়ে জল তুলছে, সে তখন আস্তে আস্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং মারলে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। বড়ো হাতিটা নীচের দিকে মুখ করে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল ইদারার ভিতরে।

চারিদিক থেকে হই-চই করে মানুষরা সব ছুটে এল। কিন্তু কী করবে তারা! ইদারার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতিকে উপরে টেনে তোলা বড়ো যে সে ব্যাপার নয়। অনেক ভেবে-চিন্তে সকলে মিলে ইদারার ভিতরে কতগুলো গাছের গুড়ি ফেলে দিলে।

তখন হাতিটা করলে কী, কতকগুলো গাছের গুড়ি নিয়ে শুড় দিয়ে নিজের দেহের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে তৈরি করে ফেললে একটা পাটাতন এবং আরও

কতগুলো গুড়ি নিয়ে সাজিয়ে ফেললে নিজের চারপাশে। তারপর বেশ সহজেই সে আবার পৃথিবীর উপরে উঠে এসে দাঁড়াল।

অবশ্য এটি হচ্ছে মানুষের দ্বারা শিক্ষিত হস্তীর গল্প। কিন্তু একেবারে বুনো হাতিও বুদ্ধিতে কম যায় না। সে সম্বন্ধেও একটা গল্প শোনো।

সিংহল দ্বীপে স্যর এডওয়ার্ড টেনান্ট দলবল নিয়ে বনের ভিতরে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটা খ্যাপা হাতি তার পিছনে তাড়া করে। স্যর এডওয়ার্ড এবং তাঁর দলের অন্যান্য লোকেরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বড়ো গাছের উপরে উঠে পড়লেন। শিকার হাত ফসকায় দেখে হাতিটা তখন গাছের গুড়িতে শুড় জড়িয়ে গোটা গাছটাকেই উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মস্ত গাছ, কিছুতেই ওপড়াতে পারলে না।

সেইখানে মাটির উপরে পড়ে ছিল অনেকগুলো কাটা গাছের গুড়ি। হাতিটা সেইখানে গিয়ে একে একে গাছের গুড়িগুলোকে সেই বড়ো গাছটার তলায় এনে স্তুপাকারে সাজিয়ে ফেলল। তারপর সে গুড়িগুলোর উপরে উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুড়ের সাহায্যে স্যর এডওয়ার্ড ও তার লোকজনকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। হয়তো তার চেষ্টা সফলও হত, কিন্তু গাছের উপর থেকে ক্রমাগত গুলি-বৃষ্টি হওয়াতে হাতিটা বিরক্ত হয়ে গুড়ির স্তুপ থেকে নেমে বনের ভিতরে চলে গেল।

শুড় দিয়ে হাতির মা বাচ্চাকে আদর করে, শাসন করে এবং তার জন্যে ভালোমন্দ ব্যবস্থাও করে। একবার একটা পোষা হাতির বাচ্চা কেমন করে অত্যন্ত আহত হয়। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হল। উনি তার ক্ষতের উপরে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিতে গেলেন, কিন্তু বাচ্চাটি কিছুতেই রাজি হল না। এমন একটা মূল্যবান জন্তু বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে ডাক্তার হতাশ ভাবে তার মায়ের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

হাতির মা বুঝতে একটুও দেরি করলে না। শুড় দিয়ে সে তখনই বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ফেললে এবং নিজের দুই পা দিয়ে চেপে ধরলে তাকে মাটির উপরে। ডাক্তার তখন ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে অনায়াসেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারলেন। কেবল সেই এক দিন নয়, তারপর যতদিন না তার ঘা সারল, ততদিন পর্যন্ত হাতির মা ডাক্তারকে এইভাবে সাহায্য করতে নারাজ হল না।

হাতিদের স্নেহ ও ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। মানুষকেও তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। বিলাতের চিড়িয়াখানায় একটা হাতি ছিল, তার নাম জিঙ্গো। সে তার রক্ষী বা মাহুতকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তাকে বিলাত থেকে পরে আমেরিকার চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাত থেকে সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় যেতে তখন বেশ কিছুদিন লাগত। জিঙ্গো কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পৌছল না। মাহুতকে দেখতে না পেয়ে, মনের দুঃখে সে পানাহার ছেড়ে দিলে। তারপর ভগ্নপ্রাণে মারা গেল সমুদ্রপথেই।

হাতি হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে ডাঙার সবচেয়ে প্রকাণ্ড জীব। তোমরা ভারতের হাতি দেখেছ, কিন্তু আফ্রিকার হাতি তার চেয়েও আকারে বড়ো। আবার ওই আফ্রিকাতেই আর এক জাতের বামন হাতি আছে, মাথায় তারা ছ-ফুটের চেয়ে উঁচু হয় না।

পৃথিবীতে মানুষরা যখন একটু একটু করে সবে সভ্য হয়ে উঠছে, সবচেয়ে বড়ো হাতি পাওয়া যেত সেই সময়ে। তার নাম হচ্ছে ম্যামথ। তারা ছিল রোমশ ।

পঞ্চম

শিকার ও শিকারি

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে দশ বৎসর। দশ বৎসর বড়ো অল্প কাল নয়। এই সময়টুকুর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ঘটেছে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে বনের ভিতরে কোনওই অসাধারণ ঘটনা ঘটেনি। প্রতিবৎসরই এক ঋতুর পর এসেছে আর এক ঋতু এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বনভূমিকেও দেখতে হয়েছে নিয়মিতভাবেই এক এক রকম। কিন্তু এসব কথা গল্পে উল্লেখ করবার মতো বিষয় নয়। কাজেই, ঠিক দশ বৎসর পরেই আমরা আবার অবলম্বন করব আমাদের গল্পের সূত্র।

এই দশ বৎসরে টুনুর চেহারা যে একেবারেই বদলে গিয়েছে, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। সে ছিল পাঁচ বৎসরের শিশু, এখন হয়েছে পনেরো বৎসরের বালিকা। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তাকে দেখলেই মনে হয়, বনবাসিনী রাজকন্যা।

সে বড়ো হয়েছে বন রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে। এখানে সমাজের কোনওই বন্ধন নেই। সমাজে যে-আচরণে নিন্দা হয়, এখানে কেউ তা আমলেই আনে না। শহরে পনেরো বৎসরের মেয়ে থাকে গুরুজনদের চোখে চোখে, কিন্তু এখানে টুনু সেই শিশুর মতোই চপল আনন্দে বনে বনে ছুটে বেড়ায় চঞ্চল হরিণীর মতো, কখনও গাছ-কোমর বেঁধে বালকদের মতোই অসঙ্কোচে গাছে গিয়ে ওঠে, ফল পাড়ে, ফুল তোলে, ডাল ধরে ঝুলে দোল খায় এবং দুলতে দুলতে হঠাৎ রুনুর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তরল কৌতুক-হস্যে।

দূর থেকে দুখিরাম ও পার্বতী তার এমনি সব লীলাখেলা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকে, কিন্তু টুনুকে মানা করবার কথা কোনওদিন তাদের মনেও ওঠে

না। বনবাসী তারা, শহরের আদপ-কায়দার কী ধার ধারে? আর টুনু তো তাদেরই মেয়ে!

টুনু যে সত্য সত্যই তাদের নিজের মেয়ে নয়, এ কথা তারাও যেন আজ ভুলে গিয়েছে। টুনুর বাপ-মা যে আর মেয়ের খোঁজ নিতে আসবে না, এ বিষয়ে আর তাদের কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে টুনুকে তাদের সামনে নিয়ে গেলেও তারা নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে না। সুতরাং পার্বতী এখন টুনুকে নিজের মেয়ে বলে অনায়াসেই দাবি করতে পারে।

কিন্তু টুনু ভোলেনি। আজও অবোধ শৈশবের আনন্দ-স্বপ্ন তার মনের মধ্যে রঙিন ছবির মতো জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। আজও কোনও কোনও দিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখে বাপের মুখ, মায়ের মুখ। টুনু কেমন করে ভুলবে? রক্তের টান ভোলা যায় না।

বাপ-মায়ের একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এখনও সে সযত্নে রক্ষা করে। দশ বৎসর আগে যে পোশাক পরে সে বাড়ির বাইরে এসেছিল প্রজাপতি ধরতে, আজ আর তা বর্তমান নেই বটে, কিন্তু তার গলায় ঝুলত যে সোনার পদকখানি, এখনও সেখানিকে গলায় পরে থাকে সে সর্বদাই। পদকের উপরে লেখা একটি নাম, রেণুকা। টুনু জানে, এইটিই তার আসল নাম।

পার্বতী এক-একদিন স্বামীকে ডেকে বলে, হ্যাঁ গো, একটা কথা ভেবে দেখেছ কি?

দুখিরাম উবু হয়ে মাটির উপরে বসে থেলো হুকোয় তামাক টানতে টানতে বলে, কী?

টুনু বড়ো হয়েছে, সে আর ছোট্টটি নেই।

হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুখিরাম বলে, তুই তো ভারী আশ্চর্য কথা বললি রে পার্বতী! টুনু যে আর ছোট্টটি নেই, সেটা কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?

পার্বতী বলে, দেখতে তো পাচ্ছ, কিন্তু মেয়ের উপায় করছ কী?

উপায় মানে?

এইবারে টুনুর জন্যে একটি বর খুঁজতে হবে তো?

দাওয়ার কোণে হুঁকোটা রেখে দুখিরাম অবহেলা-ভরে বলে, যা যা, বাজে বকিসনি! টুনু এখন এত বড়ো হয়নি যে এখুনি ওর বর খোঁজবার জন্যে আমাকে ছুটোছুটি করতে হবে।

ফিক করে হেসে ফেলে পার্বতী বলে, হ্যাঁ গো, তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল কত? আমি কি টুনুরও চেয়ে ছোটো ছিলুম না?

দুখিরাম চটে গিয়ে বলে ওঠে, তুই আর টুনু কি এক কথা? তুই হলি একটা জংলি কাঠুরের বেটি, আর আমার টুনু হচ্ছে হয়তো কোনও রাজার মেয়ে। তোর সঙ্গে টুনুর তুলনা! বলেই সে খুঃ করে মাটির উপরে থুথু ফেললে।

পার্বতী বলে, ও আমার বুদ্ধিমান কাঠুরেমশাই, তুমি কি ভাবছ টুনুকে এখন বিয়ে করতে আসবে কোনও রাজার ছেলে? সবাই তো জানে, ও হচ্ছে আমাদেরই মেয়ে।

দুখিরাম বলে, রাজার ছেলেন আসুক না আসুক, টুনুকে আমি কোনও কাঠুরে ছেলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। ফুল দিতে হয় দেবতার পায়ে, কেউ কি তা নর্দমায় ফেলে দেয় রে? দেখ দেখি আমাদের ওই টুনুর দিকে তাকিয়ে, ও কি ঠিক ফুলের মতোই সুন্দর নয়?

তারা দুজনেই বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সবুজ ঘাসে ঢাকা, বনফুল-ফোটা খানিকটা জমি, তারই উপরে কানামাছি খেলছে টুনু আর তার সমবয়সি সাত-আটটি কাঠুরেদের মেয়ে। ওখানকার আকাশ-বাতাস থেকে থেকে ছন্দিত হয়ে উঠছে তাদের কৌতুক-হাস্যরোলে। আরও খানিক তফাতে একটি

গাছতলায় চুপ করে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু খুশি মনে দেখছে টুনু আর তার বন্ধুদের লীলাখেলা।

স্নেহমমতায় বিগলিত প্রাণে সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পার্বতী ধীরে ধীরে বললে, টুনু আমার ছোট্ট খুকিটির মতন এখনও খেলা বই আর কিছু জানে না। আহা, খেলাই করুক, যতদিন পারে খেলাই করুক!

ওদিকে টুনুদের তখন শেষ হয়ে গিয়েছে কানামাছি খেলা। তারা সবাই মিলে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে শুরু করে দিয়েছে নাচ আর গান। কাঠুরেদের মেয়েগুলির রং কালো হলেও গড়ন খুব চমৎকার। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলায়, দিনে দিনে গড়ে উঠেছে তাদের স্বাধীন জীবন। যেন বনদেবীর বরে তারা পেয়েছে অটুট স্বাস্থ্যের আশীর্বাদ। তাদের প্রত্যেকেরই খোঁপায় গোঁজা বনফুল, তাদের গলাতেও ফুলের মালা, আর দুই হাতেও ফুলের গয়না। তাদের কালো কালো গায়ে রঙিন ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল বড়ো সুন্দর। এবং তাদের মাঝখানে টুনুকেও দেখাচ্ছিল যেন কোনও গোলাপকুঞ্জের মূর্তিমতী ফুলকন্যার মতো।

তারপর নাচ-গান থামিয়ে টুনু বলে উঠল, চল ভাই, আর এখানে নয়। এইবার পাহাড়তলির সেই পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি গে চল!

বাতাসে আঁচল উড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে টুনু ছুটল একদিকে, এবং অন্য মেয়েরাও ছুটল তার পিছনে পিছনে। রুনুও গজেন্দ্রগমনে চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

বনের এইখান থেকে মাইল-দশেক তফাতে আছে একটি বড়ো গ্রাম। তাকে ছোটো একটি শহর বললেও বলা যায়। সেই গ্রামে বাস করে জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ, উপাধি তার কুমার।

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে। কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ এখনও সাবালক হয়নি, বয়স তার বিশ বৎসরের বেশি

নয়। জমিদারির তদারক করে দেওয়ান, আর নরেন্দ্রনারায়ণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। এটা হচ্ছে তার একটি বাতিকের মতো।

আজ কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতি বিরূপ। সকাল থেকে তারা এ-বনে ও-বনে তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দয়ালু পশুই প্রাণ দিয়ে তাদের কৃতার্থ করতে এল না। সূর্য প্রায় মাথার উপরে, রোদের তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এবং তাদের উৎসাহ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে।

হঠাৎ নরেন্দ্র দেখলে, ডান পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটি হরিণ, তারপরেই চকিত দৃষ্টিতে শিকারিদের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল যেন বিদ্যুতের মতো।

নরেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, এতক্ষণ পরে শিকারের যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ওকে ছাড়া নয়। আমি এইদিক দিয়ে একলা ওর পিছনে ছুটি, আর তোমরা সকলেও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই জঙ্গলে ভিতরে গিয়ে ঢোক। দ্যাখো, কোনও দিক দিয়েই ও যেন পালাতে না পারে।

নরেন্দ্র নিজের বন্দুকটা একবার পরীক্ষা করে বেগে জঙ্গলের ভিতরে ছুটে গেল। খানিক তফাতে একটা ঝোপ তখনও দুলছিল। বোঝা গেল, হরিণটা ওই দিকে গিয়েছে। নরেন্দ্র সেই ঝোপ ভেদ করে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। এইভাবে শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল, কিন্তু হরিণের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বনের এক জায়গায় খোলা জমির উপরে হতাশভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র ভাবছে, শিকার দেখা দিয়েও ধরা দিলে না, আজকের দিনটা বোধহয় বৃথাই গেল।

হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনে সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। হরিণটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের কারুর পাল্লায় গিয়ে পড়েছে! সে খুশিও হল এবং সঙ্গে

সঙ্গে একটু ক্ষুণ্ণও হল এই ভেবে, আজকের শিকারের বাহাদুরিটা তাহলে গ্রহণ করবে অন্য কেউ।

সঙ্গীদের অপেক্ষায় নরেন্দ্র সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একটু তফাতে একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠল। তারপরেই ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা হরিণ। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, সে আহত হয়েছে এবং আর বেশি দূর অগ্রসর হতেও পারবে না।

হরিণটাকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যে নরেন্দ্র বন্দুকটা তুলে ধরল। কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে আর হল না। আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মেয়ে বেগে ছুটে এসে হরিণটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, খবরদার বলছি, আর এখানে বন্দুক ছুঁড়ো না!

সেইভাবেই আড়ষ্ট হাতে বন্দুক ধরে নরেন্দ্র থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। এই গভীর অরণ্যে এমন সুন্দরীর আকস্মিক আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এ কি বনদেবী, না চোখের মায়া? আহত হরিণটা তখন টুনুর আলিঙ্গনের ভিতরে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, পালাবার চেষ্টাটুকু করবার শক্তিটুকুও তার নেই।

মেয়েটি করুণ স্বরে বললে, ওরে আমার হরিণ রে, কোন নিষ্ঠুর তোকে মেরেছে? আহা হা, তোর গা দিয়ে যে রক্ত ঝরে পড়ছে!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নরেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি হঠাৎ চোখ তুলে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, কে তুমি? কেন আমার হরিণকে মেরেছ?

নরেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বললে, তোমার হরিণ!

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, আমার হরিণ। এ বনে যত হরিণ আছে সব আমার। কেন তুমি এর গায়ে গুলি মেরেছ?

নরেন্দ্র অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে বললে, আমি তো একে মারিনি?

তবে কে একে মারলে?

বোধহয় আমার কোনও বন্ধু।

পিছন থেকে কর্কশ হেঁড়ে গলায় কে বললে, আমি মেরেছি এই হরিণটাকে। দুজনেই সচমকে ফিরে দেখলে, একটা নতুন লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ তার চেহারা। প্রকাণ্ড, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রং কালো কুচকুচে। আদুড় গা, কোমর বেঁধে মালকোচা মেরে কাপড় পরা, ডান হাতে একটা বন্দুক।

এই পরমা সুন্দরী কন্যাটির মতো এখানে ওই বীভৎস ও বিভীষণ মূর্তিটার আবির্ভাবও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পেয়ে নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, এই কি তোমার বন্ধু?

নরেন্দ্র মাথা নেড়ে বললে, না, আমার কোনও বন্ধুরই চেহারা এমন উলটো-কর্তিকের মতো নয়?

লোকটা হুমকি দিয়ে বলে উঠল, মুখ সামলে কথা কও হে ছোকরা, সাক্ষাৎ যমকে ঠাট্টা করবার চেষ্টা কোরো না! জানো, আমি কে?

নরেন্দ্র বললে, জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই।

লোকটা শুকনো হাসি হেসে বললে, আমারও গায়ে পড়ে পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই। এখন বাজে কথা থাক। এই ছুঁড়ি, দে, হরিণটাকে ছেড়ে দে!

হরিণটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বললে, না, একে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

লোকটা বললে, কিছুতেই ছাড়বি না? আচ্ছা, ছাড়িস কি না দেখা যাক! আমার শিকার, আমি নিয়ে যাবই। বলতে বলতে সে এগিয়ে এল।

মেয়েটি প্রাণপণে চিৎকার করলে, রুনু! রুনু! শিগগির এসো, এই যমদূতটাকে তুলে আছাড় মারো! রুনু! রুনু!

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, রুনু আবার কে? নামটি তো মেয়েলি, তার গায়ে এমন কী শক্তি আছে যে তুলে আছাড় মারবে এই যমদূতটাকে!

প্রশ্নের উত্তর পেতে বিলম্ব হল না। দেখা গেল, বন ভেঙে, মাটি কাঁপিয়ে, শুড় তুলে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ।

ষণ্ডা লোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে টুনু হুকুম দিলে, রুনু! এই লোকটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! ওকে তুমি শাস্তি দাও!

সক্রোধে গর্জন করে উঠল রুনু। নরেন্দ্র সভয়ে নিজের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকালে। এ হাতি-মারা বন্দুক নয়, এর গুলিতে ওই মত্ত মাতঙ্গের কিছুই হবে না। সে তখনই বুদ্ধিমানের মতো সেখান থেকে দৌড় মেরে সরে পড়ল।

ষণ্ডা লোকটাও ত্রস্তভাবে বেগে পাশের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং রুনুও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

টুনু দুই হাতে হরিণটাকে ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। ছোট্ট হরিণ, তাকে তুলতে তার কিছুই কষ্ট হল না। তারপর সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, চল তো ভাই হরিণ, এইবারে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে যাই।

ষষ্ঠ

বনদেবীর ঠিকানা

জমিদারবাড়িখানি বেশ বড়োসড়ো। চারিদিকে ঘেরা জমির ভিতরে সাজানো ফলফুলের বাগান, তারপর একটি বড়ো পুষ্করিণী, তার চারধারের চারটি ঘাট মার্বেল পাথরে বাধানো। সেই পুষ্করিণীর উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে টুকটুকে লাল রঙের প্রাসাদখানি যেন কালো জলের ভিতরে নিজের ছায়া দেখবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফটকে বন্দুকধারী দ্বার এবং বাড়ির প্রধান দরজার পাশে একখানি টুলের উপরে বসে একটা ভোজপুরী দ্বারবান বা হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খৈনি পিষতে পিষতে ভোরের ভজন ভজিছে—

মনোয়া, ভজ লে সীতারাম!
ভজ লে সীতারাম, মনোয়া,
কাহে না জপতে নাম।'

গাড়ি-বারান্দার উপরে একখানি চেয়ারের উপরে বসে নরেন্দ্র নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছে পুষ্করিণীর দিকে।

পুকুরে বাতাসে দোলানো ও ছোটো ছোটো ঢেউ-খেলানো স্নিগ্ধ জলের উপরে এসে পড়েছে প্রাতঃসূর্যের সোনালি আলোর ছায়া। ওখানে পদ্মকুঞ্জের উপরে গুঞ্জন করে উড়ছে মধুকরপুঞ্জ। এখানে সন্তরণ-পুলকে মেতে উঠেছে মরাল আর মরালীরা। কোথাও বা টুপটুপ করে জলের ভিতরে ডুব দিচ্ছে ডাহুক পাখিরা।

কিন্তু পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও নরেন্দ্র এসব কিছুই লক্ষ করছিল না। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে তখন গহন বনের অন্তপুরে।

সেই অপূর্ব রূপবতী মেয়ে! কে সে? বনের আনাচে-কানাচে কয়েক ঘর বাসিন্দা আছে বটে, কিন্তু তারা তো, আমরা যাকে বলি ছোটাোলোক! তাদের ঘরে অমন অদ্ভুত রূপের জন্ম হওয়া কি সম্ভব? না, কখনওই নয়। কিন্তু—

কিন্তু ও যে বনের মেয়ে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তার ভাবভঙ্গি, তার কথাবার্তা ও তার সাজ-পোশাকে কোথাও নেই নাগরিকতার ছাপ। এ এক আশ্চর্য সমস্যা!

বলে কিনা, বনে যত হরিণ আছে সব আমার! আবার ও ডাক দিলে সাহায্য করতে ছুটে আসে মত্ত মাতঙ্গ! এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে, না এসব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে? হয়তো বনের বাঘগুলো পর্যন্ত ওই মায়াবিনীর পোষ মেনেছে!

হোক মায়াবিনী, হোক কুহকিনী, কিন্তু কী সুন্দরী!

যেমন করে হোক, তার সঙ্গে পরিচয় করতেই হবে। আজকেই আবার যাব আমি বনের ভিতরে।

সংকল্প স্থির করে নরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পোশাক বদলে বেরিয়ে এল আবার বাড়ির ভিতর থেকে। সেদিন আর কোনও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিলে না সে।

আজ নরেন্দ্র একখানি সাইকেলের আরোহী। মাইল-দশেক পথ পায়ে হেঁটে পার হতে কম সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি কালকের ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে আজ সে সাইকেলের সাহায্য গ্রহণ করেছে। অবশ্য আজও সে নিরস্ত্র নয়, তার পিঠে বাধা একটি বন্দুক।

ঘণ্টা দুই পরে সে বনের প্রান্তদেশে এসে পড়ল। আরও খানিকটা এগুবার পর পায়েচলা পথের রেখাটি হয়ে গেল লুপ্ত এবং অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল বনজঙ্গল। নরেন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে সাইকেলখানি একটা ঝোপের ভিতরে রেখে দিয়ে পদযুগলেরই সাহায্য গ্রহণ করলে।

প্রায় আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল আবার সেই কালকের ঘটনাস্থলটি। কিন্তু আজ সেখানে জনপ্রাণী নেই। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলে, কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য মেয়ে?

এক জায়গা দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ছুটে চলে গেল একপাল বন্য বরাহ। মাঝে মাঝে দু-একটা শৃগাল জঙ্গলের ভিতর থেকে একবার দেখা দিয়ে উকি মেরেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারেই। শুকনো পাতার ভিতরে এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল মস্ত একটা কাল সাপ, নরেন্দ্রের পায়ের শব্দে চমকে উঠে ফণা তুলে তীব্র দুই চক্ষে জ্বলন্ত ঘৃণা বৃষ্টি করে সাঁৎ করে ঢুকে গেল কোনও অন্তরালে। এক জায়গায় গাছের উপরে মুখ খিঁচিয়ে কিচির-মিচির করে গালাগাল দিয়ে উঠল একদল বদর, এখানে নরেন্দ্রের মতো চেহারা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

একটা গাছের গোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে নরেন্দ্র শুনতে লাগল এখানে-ওখানে বুনো কপোতদের ক্লান্ত-কাতর ঘুঘু ঘু ঘু সুর। গাছের তলায় ঝিলমিল করছে আলো আর ছায়া। ওদিকের স্নিগ্ধ-সবুজ মাঠটির উপরে সচল ছবির মতো পট-পরিবর্তন করছে আলো আর ছায়া, ছায়া আর আলো। চারিদিকে বেশ একটি নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব। নরেন্দ্রের দুই চোখে লাগল ঘুমের আমেজ। কিন্তু হিংস্র জন্তুদের এই স্বদেশে ঘুমিয়ে পড়বার ভরসা হল না তার। জোর করে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত তুলে আলস্যি ভেঙে নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, নাঃ, বনদেবী দেখছি আজ আমার উপরে সদয় হবেন না! বেলাও হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। আজকের মতো এইখানেই বনবাসের ইতি করা যাক......

তার পরদিন, আবার তার পরদিন, আবার তার পরদিন নরেন্দ্র আবার এল বনভ্রমণে। এই বন তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। দূর থেকে কোনও এক অজানা টানে বন যেন তাকে এখানে টেনে আনে। সে আশায় এখানে আসে তা সফল হয় না, তবু কোনও এক সম্ভাবনার ইঙ্গিতে রোজ তাকে এখানে ছুটে

আসতে হয়। ছুটে আসে অসীম আগ্রহে, কিন্তু ফিরে যায় নিস্তেজ দেহে, ম্রিয়মাণের মতো। কেবল সেই ঘটনাস্থলে নয়, বনের নানা জায়গায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ দিন বনের ভিতরে এসে নরেন্দ্র দূর থেকে দেখলে একটা হাতিকে। সে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে কচি কচি বাঁশপাতা ছিঁড়ে ভক্ষণ করছিল। নরেন্দ্র তাকে দেখেই চিনলে। এ হচ্ছে সেই হাতি—বনদেবীর যে প্রহরী, নাম যার রুনু।

নরেন্দ্র আন্দাজ করতে পারলে, হাতির দেখা যখন পাওয়া গিয়েছে, মেয়েটিও নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোনও জায়গায়। কিন্তু মেয়েটি সত্যি-সত্যিই যদি এখানে আসে, তাহলে তাকে কেমন করে অভ্যর্থনা করবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। কে জানে, আজকেও সে আবার এই হাতিটাকে তার পিছনে লেলিয়ে দেবে কি না!

হাতির কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখবার জন্যে নরেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির উপরে আরোহণ করলে। তারপর ডালপালার আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা ভেবেছে তাই! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মেয়েটি বোধহয় কোচড়-ভরা ফুল নিয়ে চঞ্চল পায়ে ছুটতে ছুটতে হাতিটার কাছে দাঁড়াল। তারপর বললে, রুনু, আমার ফুল তোলা শেষ হয়েছে, এইবারে আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো।

নরেন্দ্র অবাক হয়ে দেখলে, হাতিটা তার শুড় খানিকটা নীচে নামিয়ে দিলে, আর মেয়েটি সেই শুড় ধরে অনায়াসেই হাতির মাথার উপরে উঠে এসে বসল। তারপর হাতিও ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, হুঁ, তাহলে এই বনেই মেয়েটির বাড়ি আছে। আচ্ছা, চুপিচুপি ওদের পিছনে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসা যাক।

নরেন্দ্র গাছের উপর হতে আবার হল ভূমিষ্ঠ। তারপর হাতিকে অনুসরণ করলে অত্যন্ত সন্তপর্ণে।

প্রায় মাইল দুই পথ অতিক্রম করে হাতি যেখানে এসে থামল, তার কাছেই রয়েছে কতকগুলো কুঁড়েঘর। হাতি আস্তে আস্তে মাটির উপরে থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল, এবং মেয়েটিও লাফিয়ে পড়ল তার দেহের উপর থেকে। হাতির দিকে ফিরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললে, 'রুনু ভাই, আজ তবে আসি।' বলেই ছুটতে ছুটতে সে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে চলে গেল। কোনও ঘরে সে ঢোকে, সেটাও দেখবার ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের। কিন্তু হাতিটা আবার এই পথেই ফিরে আসছে দেখে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিনের ব্যাপার এই পর্যন্ত। কিন্তু এইটুকুতেই তার মনে মনে নেচে বেড়াতে লাগল হাসিখুশি। বনদেবীকে আবার আবিষ্কার করতে পেরেছে, এ হচ্ছে মস্ত সৌভাগ্যের কথা। নরেন্দ্র সেদিন পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে বন ছেড়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

তার পরদিন বনের ভিতরে নরেন্দ্রর দেখা পাওয়া গেল খুব সকাল সকাল। আজ ভোরের পাখি ডাকবার আগেই সে করেছে গৃহত্যাগ এবং যথাস্থানে গিয়ে যখন পৌঁছল তার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন বেলা সাতটা। বনের পাখিদের কণ্ঠে তখনও স্তব্ধ হয়নি প্রভাতসংগীত। নরেন্দ্র একটা ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরেই একটি ছোটো ডালা হাতে করে সেই মেয়েটি একখানি কুঁড়েঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

দুখিরাম তখন বনে যাবার আগে পান্তা ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে হুকোয় দিচ্ছিল শেষ টান। টুনুকে দেখে বললে, কী গো টুনটুনি, এত সকালে কোথায় চলেছ?

টুনু বললে, বাবা, পুণ্যপুকুর ব্রত নিয়েছি কিনা, তাই বন থেকে গোটাকয় ফুল আর বেলপাতা তুলে আনতে যাচ্ছি।

এ-গাছ ও-গাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে টুনু এগিয়ে চলল তারপর একটি বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বললে, পাতাগুলো যে বড় উঁচুতে রয়েছে, কেমন করে পাড়ি? বাব্বাঃ, বেলগাছে যা কাঁটা! ও গাছে কে চড়বে! দুষ্টু রুনু তো আজ এখনও এল না, আমায় বেলপাতা পেড়ে দেবে কে?

পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে বললে, বনদেবী, আমি যদি তোমার রুনুর হয়ে বেলপাতা পেড়ে দি, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?

টুনু চমকে উঠে পাশের ঝোপটার দিকে তাকালে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তুমি আবার কে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখানকার কেউ নও। ওই ঝোপে বসে কী করছ তুমি?

তোমার কথাই ভাবছি। এই বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে নরেন্দ্র।

টুনু সবিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর নীরবে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নরেন্দ্র হেসে বললে, আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে?

টুনু বললে, ভয়? ভয় আমি কারুকেই করি না। তুমি তো দেখছি সেদিনকার সেই শিকারি!

নরেন্দ্র বললে, আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ?

টুনু বললে, চিনতে পারব না কেন? কিন্তু আজও দেখছি তোমার পিঠে বাঁধা বন্দুক। এখানে আবার কী করতে এসেছ?

শিকার করতে নয়।

তবে?

তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। এবং হাসতে হাসতেই দুই চোখ নাচিয়ে বললে, ওহো, কী মজার কথা! আমার সঙ্গে আবার কেউ আলাপ করতে আসে নাকি? আমি কি খুব একটা মস্ত লোক?

তুমি বনদেবী।

টুনু প্রাণপণে আরও জোরে হেসে নিলে খুব খানিকটা। তারপর বললে, না গো শিকারি মশাই, আমি বনদেবী-টেবি কিছু নই। আমি হচ্ছি টুনু।

টুনু? বাঃ, দিব্যি নামটি তো! আমিও শিকারি নই।

তবে তুমি কী?

আমার নাম নরেন।

তোমার নামটিও ভালো লাগল। তোমার বাড়ি কোথায়?

এই বনের বাইরে।

সেখানে তুমি কী করো?

খাই দাই, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি।

বটে? তবে তো তুমি খুব কাজের মানুষ! এত কাজ করো কী করে, কষ্ট হয় না?

কষ্ট হয় বই কি! বড়ো একঘেয়ে লাগে। তাই তো সে সব কাজ ছেড়ে আজকাল আমি বনের ভিতরে বেড়াতে আসি।

টুনু মুখ গম্ভীর করে বললে, বেড়াতে আসো, না হরিণ মারতে আসো?

নরেন্দ্র কাঁচুমাচু মুখে বললে, তুমি তো জানো টুনু, সেদিনকার সেই হরিণটা আমি মারিনি।'

মারোনি, মারতে পারতে তো?

তা হয়তো পারতুম।

তোমার মতো নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে আমার আর কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

টুনু সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল।

নরেন্দ্র কাতর ভাবে তাড়াতাড়ি বললে, না টুনু, যেয়ো না। তুমি যখন মানা করেছ, আমি আর কখনও হরিণ মারব না।

হরিণ মারবে না, কিন্তু পাখিটখি মারবে তো?

বেশ, তাও মারব না।

সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি।

তবে তিন-সত্যি গালো!

মনে মনে হাসতে হাসতে নরেন্দ্রকে তিন-সত্যি গালতে হল গম্ভীর মুখে।

টুনু এগিয়ে এসে অসঙ্কোচে নরেন্দ্রের একখানা হাত ধরে বললে, তাহলে নরেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।

তাহলে রোজ আমি এখানে আসব?

এসো।

অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু এখনও সে উঠতে পারে না। ঘাসের বিছানা পেতে আমি তাকে শুইয়ে রেখেছি।

তোমার মা-বাবা কোথায়?

হাত দিয়ে নিজেদের কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে টুনু বললে, ওইখানে।

তোমার বাবা কী করেন?

বনে বনে কাঠ কাটেন।

বনে বনে কাঠ কাটেন!

হ্যাঁ। তিনি কাঠুরে।

বিস্মিত ভাবে নরেন্দ্র একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, টুনু, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। একটু দাঁড়াও, তোমার জন্যে বেলপাতা পেড়ে দিই।

টুনু বললে, না নরেন, আর তোমাকে গাছে চড়তে হবে না। বেলপাতা যে পেড়ে দেবে, ওই দ্যাখো সে আসছে।

টুনুর দৃষ্টি অনুসরণ করে নরেন ফিরে দেখলে, ধীরে ধরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই প্রকাণ্ড হাতিটা।

সঙ্কুচিত ভাবে সে বললে, ওই হাতিটা আমাকে দেখে রেগে যাবে না তো?

না, না, আমার রুনু ভারী ভালো মানুষ। আমার যাকে ভালো লাগে তাকে সে কিছুই বলে না।

রুনু তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ ভাবে আড়ষ্ট হয়ে রইল। রুনু শুড়টা নরেন্দ্রের দেহের কাছে নিয়ে গিয়ে একবার আঘ্রাণ নিলে, পরীক্ষার ফল বোধহয় হল সন্তোষজনক। রুনু বুঝতে পারলে, এই নতুন মানুষটা তার টুনুরই বন্ধু।

টুনু বললে, নরেন, আমার পুজোর সময় হল। আজ তুমি বাড়ি যাও।

টুনু হাসতে হাসতে বললে, বলেছি তো, এসো। রুনু! আমার পুজোর বেলপাতা পেড়ে দাও। সে বেলগাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

সপ্তম

খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক

তারপর থেকে বনের ভিতরে নরেন্দ্রর আগমন হতে লাগল প্রতিদিনই।

রোজ সকালে সে বেলগাছের পাশে সেই ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, এবং টুনুও তাকে দেখলেই এলোচুল উড়িয়ে ছুটে আসত হাসতে হাসতে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নরম ঘাস-বিছানায় বসে তারা দুজনে গল্প করত। টুনু বলত বনের গল্প, আর শহরের গল্প সে শুনত নরেন্দ্রর মুখে। নরেন্দ্র টুনুর মতো বনকে ভালো করে চেনে না, আর টুনু তো জানে না শহরের কোনও কথাই। কাজেই দুজনেরই গল্প দুজনেরই খুব ভালো লাগত।

নরেন্দ্র কলকাতা শহর দেখেছে, এবং যখন সেখানকার গল্প বলত, তখন টুনুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠত উচ্ছসিত বিস্ময়ে।

নরেন্দ্র বলত, কলকাতা শহরটি তোমাদের এই বনের মতোই প্রকাণ্ড। এই বনে যেমন বড়ো বড়ো গাছ গুনে ওঠা যায় না, তেমনি কলকাতা শহরে এত বড়ো বড়ো বাড়ি আছে যে তার হিসাব কেউ রাখতে পারে না। তোমাদের এই কাঠুরে গ্রামটাকে কলকাতার এক একটি মাঝারি বাড়ির ভিতরে পুরে ফেলা যায়।

টুনু বলত, বলো কী নরেন!

নরেন্দ্র বলত, হ্যাঁ। আর সেখানে এমন সব বড়ো বড়ো বাড়িও আছে, তোমাদের এই বনের সবচেয়ে বড়ো গাছগুলোকেও তাদের তলায় পুতে দিলেও দেখাবে যেন ছোটো ছোটো ফুলগাছের চারা।

টুনুর মুখে বিস্ময়ে আর কথা ফোটে না।

নরেন্দ্র বলে, কলকাতার এক একটা বড়ো রাস্তা তোমাদের এই বনের ছোটো ছোটো মাঠের মতো চওড়া। সেসব রাস্তা আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর তার উপর দিয়ে রোজ চলাফেরা করে লক্ষ লক্ষ লোক।

টুনু রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুটস্বরে বলে, লক্ষ লক্ষ লোক! সে কত, নরেন? আমি হাজার পর্যন্ত গুনতে পারি।

নরেন হেসে বলে, একশো হাজারে হয় এক লক্ষ। কলকাতায় চল্লিশ লক্ষ লোক আছে। কলকাতার রাস্তায় খালি লক্ষ লক্ষ লোক নয়, তার উপরে তিরের মতো ছোটাছুটি করে ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম!

সে আবার কী?

ওগুলো হচ্ছে এক এক রকম গাড়ির নাম।

আমি একবার ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি। ওগুলো কি সেই রকম দেখতে?

না। কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি আছে, মানুষে-টানা রিকশা গাড়ি আছে, আবার গোরুর গাড়িও আছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সি বাস আর ট্রাম, মানুষ বা জন্তু টানে না। ওগুলো কলের গাড়ি, আপনিই চলে। আর এত জোরে ছোটে যে, প্রতিদিনই দলে দলে লোক তার তলায় পড়ে মারা যায়।

টুনু শিউরে উঠে বলে, ওগো মা গো, আমি কোনওদিন কলকাতায় যাব না! তার চেয়ে আমার এই বনই ভালো!

তোমাদের এই বনেও তো মানুষখেকো জন্তু আছে!

তা আছে। কিন্তু তারা তো রোজ মানুষ মারে না! আমাদের এই গাঁয়ের কেউ কোনওদিন তাদের খপ্পরে পড়ে মারা যায়নি।

তারা এমনি সব গল্প করে, আর ইতিমধ্যে রুনু তাদের কাছটিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। প্রথম প্রথম রুনুর খুব হিংসে হয়েছিল। সে ছাড়া টুনুর সঙ্গে আর কেউ যে এত বেশি মেলামেশা করে, এটা তার ভালো লাগেনি। তখন মাঝে মাঝে বোধহয় তার মনে হত, লোকটার পিঠে শুড়ের বাড়ি এক ঘা দেব নাকি? কিন্তু তারপর সে যখন দেখলে, টুনু এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে আর ভালোও বাসে, তখন তার মনের রাগ ধীরে ধীরে মুছে ফেললে, মনে মনেই।

একদিল সকালে এসে টুনু বললে, হ্যাঁ নরেন, তুমি তো খালি খালি শহরের গল্পই বলো। কিন্তু এই বনের ভিতরটা কোনওদিন ভালো করে দেখেছ কি?

নরেন্দ্র বললে, না।

তাহলে চলো, আজ আমরা রুনুর সঙ্গে বনের চারদিকটা একবার ঘুরে আসি।

নরেন্দ্র বললে, রুনুর সঙ্গে মানে?

রুনু আমাদের পিঠে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।

নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, তোমার রুনু কি আমাকে তার পিঠে চড়তে দেবে?

কেন দেবে না? আমি বললেই দেবে। এই বলে টুনু গেল রুনুর কাছে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার শুড়ের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বললে, হ্যাঁ রুনু, আমার সঙ্গে নরেনকেও তোমার পিঠে করে বেড়িয়ে আনবে কি?

রুনু মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর চার পা মুড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। টুনু তার মাথার কাছে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল এবং নরেন্দ্র উঠে বসল তার পিঠের উপরে। তারপর রুনু আবার উঠে দাঁড়াল এবং হেলে-দুলে বনের ভিতর দিকে অগ্রসর হল।

দুই হাতে রুনুর দুই কান চেপে ধরে টুনু বসে ছিল দিব্যি জাঁকিয়ে। নরেনেরও হাতিতে চড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু সে হাওদাতে বসে। হাওদা-ছাড়া হাতির এই তেলা পিঠের উপরে বসে ধরবার কোনও অবলম্বন না পেয়ে নরেন্দ্র পড়ল বড়েই অসুবিধায়। প্রতিক্ষণেই তার মনে হতে লাগল, এই বুঝি গড়গড়িয়ে গড়িয়ে হাতির পিঠের উপর থেকে হয় পপাত ধরণীতলে!

তার অসুবিধা বুঝে টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, ও নরেন, যদি আছাড় খেতে না চাও তাহলে পিছন থেকে দু-হাতে আমার দু-কাঁধ চেপে ধরো।

চলল রুনু গজেন্দ্রগমনে। কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও নদীর তীরে তীরে—চারিদিককার নিবিড় ও তরুণ শ্যামল উৎসবের মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে নীল পাহাড়গুলো যেন তাদের মুখের পানেই তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। বনের ভিতরে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে পাখিরা সব ডেকে ডেকে ওঠে—তাদের মুখে মুখে ফোটে কত রাগ রাগিনী, কত রকম সুর ও ছন্দ! পাহাড়ের বুক থেকে সূর্যকিরণে বিদ্যুৎবালিকার মতো ঝরনা নাচতে নাচতে আসে পৃথিবীর সবুজ প্রাণের উপরে আসর পাতবে বলে।

নরেন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এতদিন সে বনের এখানে-ওখানে আসত শিকারির হিংস্র চক্ষু নিয়ে। অরণ্যের অন্তঃপুরে এমন বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার আছে, এটা দেখবারও অবকাশ কোনওদিনই তার হয়নি। রুনুর পিঠের উপরে টুনুর কাঁধ ধরে বসে আজ সে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলে প্রকৃতি কত সুন্দরী!

টুনু বললে, দেখছ নরেন, তোমাদের কলকাতার রাস্তার মতো এখানে বিপদের কোনও ভয় নেই?

এদিকে ওদিকে তৃপ্ত চোখে তাকাতে তাকাতে নরেন্দ্র অভিভূত কণ্ঠে বললে, দেখছি! তোমার মতো আমারও এই বনের ভিতরেই বাসা বাঁধতে সাধ হচ্ছে।

ঠিক তার দিন-তিনেক পরের ঘটনা। রুনুর পিঠে চেপে সেদিনও বনের ভিতরে গিয়েছিল তারা দুজনে। সেদিন একটু বেশি দূরেই গিয়ে পড়েছিল।

সেখানটা এত নির্জন যে, দুনিয়ায় পাখি ছাড়া আর কোনও জীব আছে বলে সন্দেহ হয় না।

খানিকটা তফাতে রয়েছে একটি ঝরনা তলা। নির্ঝরের স্বচ্ছ শুভ্র জল সেখানে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মাটির উপর এসে সৃষ্টি করেছে ছোট্ট একটি নদী।

টুনু হঠাৎ বললে, রুনু, আমাকে নামিয়ে দাও। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।

রুনু মাটির উপরে বসে পড়ল।

নরেন্দ্র বললে, আমারও তেষ্টা পেয়েছে।

রুনুর পিঠ ছেড়ে দুজনে নীচে নেমে ঝরনা-তলায় গিয়ে অঞ্জলি ভরে জলপান করতে লাগল।

রুনু আসতে আসতেই দেখে নিয়েছিল, একটা গাছে ফলে আছে অনেকগুলো পাকা ফল। এই অবসরে সে-ও চলল ফলাহার করতে।

জলপানের পর টুনু দাঁড়িয়ে উঠে উপর দিকে মুখ তুলে সশব্দে ঘ্রাণ নিতে নিতে বললে, নরেন, কী চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে! তুমি এইখানে বোসো, ফুলগুলো কোথায় ফুটেছে দেখে আসি। বলেই নরেনকে জবাব দেবার কোনও ফাঁক না দিয়েই একদিকে চলে গেল সে চুল আর আঁচল উড়িয়ে।

নরেন্দ্র জানে, বনের ভিতরে টুনুর খবরদারি করে রুনু। কাজেই সে আর কোনও মাথা না ঘামিয়ে একখানা পাথরের উপরে বসে বসে একমনে দেখতে লাগল ঝরনার নাচ। খালি নাচ নয়, শুনতে লাগল তার গানও।

খানিক পরেই সে সচমকে শুনতে পেলে বনের ভিতর থেকে টুনুর আর্তস্বর। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে টুনু যেদিকে গিয়েছিল সেইদিকে বেগে দৌড়তে লাগল। টুনু সকাতরে চিৎকার করে বলছে, নরেন। নরেন! রুনু, রুনু, রুনু! ফল-খাওয়া ফেলে রুনুও দুই কান উপর দিকে তুলে দ্রুতপদে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এল ।

পাগলের মতন বনের ভিতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল টুনু, তার দুই চক্ষে বিষম আতঙ্কের ভাব! আরও কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ সে হোচট খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একখানা উঁচু বড়ো পাথরের উপরে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল মস্ত একটা বাঘ! পাথরের উপরে এসে লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল সশব্দে। তার পরেই নীচে টুনুর উপরে লাফ মারবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ।

রুনু শূন্যে শুড় তুলে বন কাঁপানো ভীষণ গর্জন করে উঠল—কিন্তু টুনুর কাছ থেকে সে এখনও খানিকটা দূরে রয়েছে, টুনুর কাছে যাবার আগেই বাঘ লাফিয়ে পড়ে শিকার নিয়ে আবার বনের ভিতর পারিয়ে যাবে। রুনু তার গতি আরও বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলে, আর সে তার টুনুকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ গুড়ুম করে গর্জে উঠল নরেন্দ্রের হাতের বন্দুক এবং পরমুহুর্তেই বাঘটা ধপাস করে নীচেকার মাটির উপরে পড়ে চিত হয়ে চার পা তুলে যেন শূন্যকেই থাবা মারতে লাগল।

টুনু তাড়াতাড়ি মাটির উপর থেকে উঠে পড়ে আবার এদিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘটা তখনও মরেনি। মুখের শিকার পালায় দেখে সে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে গর্জন করে উঠল দুর্জয় আক্রোশে। আবার সে সামনের দিকে লাফ মারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রুনু এবারে আর তাকে কোনও সুযোগই দিলে না। সে লাফ মারবার আগেই রুনু তার কাছে গিয়ে পড়ল এবং তারপর চোখের নিমেষে নিজের অজগরের মতো মোটা শুড় দিয়ে বাঘের দেহকে জড়িয়ে ধরে মাটির উপরে সক্রোধে আছাড় মারতে লাগল বারংবার। যতক্ষণ না বাঘের দেহটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হল ততক্ষণ তাকে ছাড়লে না!

টুনু ছুটতে ছুটতে এসে নরেন্দ্রের পায়ের কাছে বসে পড়ে সভয়ে দুই চক্ষু দুই হাতে ঢেকে ফেলে কাঁদতে লাগল আকুল ভাবে। নরেন্দ্র তার পাশে বসে পড়ে সস্নেহে বললে, না টুনু, কেঁদো না। আর কোনও ভয় নেই, বাঘকে রুনু একেবারে মেরে ফেলেছে।

টুনু দুটি সজল চোখ তুলে বললে, বাঘটাকে রুনু মেরেছে, না তুমি মেরেছ? তুমি না থাকলে আজ কি আমি বাঁচতুম?

নরেন্দ্র বললে, দেখছ তো টুনু, তুমি আমাকে বন্দুক আনতে মানা করেছিলে! এই বন্দুকটা সঙ্গে না থাকলে আজ তোমার কী হত বলো দেখি?

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে টুনু হঠাৎ ফিক করে হেসে বললে, খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক বন্ধু! এবার থেকে রোজ বন্দুক সঙ্গে এনো! কিন্তু দেখো, যেন হরিণ আর পাখি মেরো না।

নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। বনের মেয়ে টুনু, তাই এত শীঘ্র এত বড়ো বন্য বিপদটাকে ভুলে হাসতে পারলে।

ইতিমধ্যে রুনুও তাদের কাছে এসে দাঁড়াল—তার শুড়টা তখনও রক্তমাখা। একবার নরেন্দ্রের দিকে তাকালে, সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল যেন কৃতজ্ঞতার ভাব। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, নরেন্দ্র না থাকলে তার টুনু আজ কিছুতেই বাঁচত না।

রুনু আর সেখানে থাকতে রাজি নয়। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে তাকালে টুনুর মুখের দিকে। তার মনের ভাবটা এই ওহে টুনু, এই সাঙ্ঘাতিক জায়গায় আর থাকা উচিত নয়। চটপট আমার পিঠে উঠে পড়ো!

অষ্টম

বন্ধুদের মাথাব্যথা

এদিকে কাঠুরেপাড়ায় পড়ে গেছে সাড়া।

টুনুর বনের সঙ্গিনীরা খেলা করতে এসে তাকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম দিন-কয়েক ভারী অবাক হয়ে গেল। তারা আসবার আগেই টুনু রোজ সকালে খেলা করবার জন্যে তাদের অপেক্ষায় দাওয়ায় বসে থাকত। কিন্তু এখন সেই টুনুর টিকি দেখবার জো নেই! ব্যাপার কী?

তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে পার্বতী বলে, টুনু কোথায় গেছে, জানি না তো! বোধহয় রুনুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।

তারা বলে, বা রে, আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই?

পার্বতী বলে, টুনু এখন ধেড়ে মেয়ে হল, আর কতদিন তোদের সঙ্গে খেলা করবে রে? যা, পালা!

কিন্তু টুনুর ঠিকানা আবিষ্কার করতে সঙ্গিনীদের বেশি দেরি লাগেনি। একদিন তারা দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিলে, টুনু গল্প করছে একটি চমৎকার-দেখতে ছেলের সঙ্গে।

সেদিন যখন টুনু ফিরে এল, তার কাছে তার সঙ্গিনীরা ধরনা দিয়ে পড়ল। কেউ বললে, ও টুনু, ওই সুন্দর ছেলেটি কে ভাই?

কেউ বললে, এবার থেকে আমাদের ছেড়ে তুই কি ওরই সঙ্গে খেলা করবি?

কেউ বললে, ও কি তোর বর হবে, ভাই?

শেষ কথাগুলো যে বললে, টুনু ধাঁ করে তার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, মারলি কেন ভাই?

টুনু চোখে রাগ ফুটিয়ে বললে, তুই নরেনকে আমার বর বললি কেন? ও তো আমার বন্ধু!

তোর বন্ধুর নাম বুঝি নরেন?

হ্যাঁ।

তা বন্ধু যখন হয়েছে বর হতে আর কতক্ষণ!

কথাটা পার্বতীরও কনে উঠল। সে-ও একদিন কৌতুহলী হয়ে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে এল নরেনকে। মনে মনে বললে, বাঃ, কী মিষ্টি ছেলেটি!

শহরের ব্যাপার নয়, বনের ব্যাপার। টুনু শহুরে মেয়ে হলে, পরের ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে বলে আজ তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক বকুনি খেতে হত। কিন্তু পার্বতী টুনুকে কিছু না বলে সন্ধ্যার সময় স্বামীর কাছে সব কথা জানালে। সঙ্গে সঙ্গে টীকা করলে, ওই রকম একটি ছেলের সঙ্গে যদি টুনুর বিয়ে হয়, তাহলে দেখতে-শুনতে কেমন চমৎকার হয় বলো দেখ?

দুখিরাম খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে, ও ছেলেটির সঙ্গে টুনুর ভাব হল কেমন করে?

পার্বতী বললে, সে কথা আমি জানিনে, তোমার মেয়েই জানে। তাকে জিজ্ঞেস করব নাকি?

দুখিরাম বললে, না, আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। কাল সকালে আগে আমি ছেলেটিকে দেখি।

পরদিন সকালে সুখিরাম দূর থেকে লুকিয়ে দেখে নিল নরেন্দ্রকে। দেখেই তার দুই চোখ উঠল চমকে। সে একরকম উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতেই এসে ডাকলে, পার্বতী, অপার্বতী!

পার্বতী ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী গা?

দুই চোখ কপালে তুলে দুখিরাম বললে, ওরে পার্বতী, ও রাজার ছেলে যে রে!

পার্বতী প্রথমটা বুঝতে না পেরে বললে, কে রাজার ছেলে?

আমাদের টুনুর সঙ্গে যার ভাব হয়েছে।

বলো কী? হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! ওরা এখানকার মস্ত বড়ো জমিদার। ওর বাপের নাম রাজা ভূপেননারান! রাজা যখন বেঁচে ছিল, তখন তার নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। কী রে পার্বতী, আমি তোকে বলেছিলুম না, যার-তার সঙ্গে কোনওদিনই টুনুর বিয়ে হবে না? দেখলি, আমার কথা ফলল কি না?

পার্বতী হেসে ফেলে বললে, যাও যাও, বাজে বকবক কোরো না! কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, উনি এখনই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছেন! তোমার ভীমরতি ধরেছে গো, ভীমরতি ধরেছে!

ওদিকে নরেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ সকালে জমিদারবাড়িতে এসে দেখে, বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে পাখি। দ্বারবানের মুখে খবর পায়, নরেন্দ্র বন্দুক নিয়ে শিকারির সাজ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে, ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কুমার বাহাদুর বন্দুক নিয়ে রোজ শিকার করতে বেরিয়ে যান একলা? কেন? আগে তো তাদের সঙ্গে না হলে তার চলত না! আজকাল আবার হঠাৎ এই একলা শিকারে যাবার বেয়াড়া শখ হল কেন?

কেউ কেউ মাথা নেড়ে বলে, এ যেন কেমন কেমন লাগছে, না?

কেউ সায় দিয়ে বলে, একেবারে অভিনব আর কী?

কেউ বা বলে, কুমার বাহাদুর কি হঠাৎ কোনও কারণে আমাদের উপরে চটে গেলেন?

অন্য সকলে বলে, চটবেন কেন? আমরা তো কেউ কোনও দোষ করিনি!

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে নরেন্দ্রকে গিয়ে গ্রেপ্তার করলে। মুখের পর মুখ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বৃষ্টি হতে লাগল।

হ্যাঁ কুমার বাহাদুর, রোজ সকালে আপনি কোথায় যান বলুন দেখি?

শিকার করতে।

তা, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?

বন্ধুরা সবাই জানত, নরেন্দ্রের কবিতা রচনা করবার বাতিক আছে। সে সেই বাতিকের আশ্রয় গ্রহণ করলে। বললে, বনের ভিতরে যাই কেন জানো? কবিতা লিখতে।

না হে অসীম, বন হচ্ছে অতি নির্জন স্থান। সেকালের মুনি-ঋষিরা সাধনার জন্যে বনে যেতেন, তা কি শোনোনি? কবিতাও হচ্ছে দস্তুরমতো সাধনার জিনিস। বেশ নিরিবিলি জায়গা না হলে কি কবিতা লেখা যায় হে?

উত্তরটা কারুরই মনের মতো হয় না।

অসীম বলে, কবিতা লেখার জন্যে তো দরকার হয় কলম। রোজ তুমি বন্দুক নিয়ে যাও কেন?

নরেন্দ্র বলে, বনের বাঘ যদি হালুম করে তেড়ে আসে, তখন কি আমি কবিতা পাঠ করে তার মাথা ঠান্ডা করব? তখন যে মসির বদলে দরকার হয় অসির। আমি না হয় অসির আর এক ধাপ উপরে উঠে ব্যবহার করি বন্দুক। তা, এজন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বাপু?

কিন্তু নরেন্দ্রের এত কথা শুনেও বন্ধুদের মাথাব্যথা একটুও কমল না। নরেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তার পিছু পিছু গিয়ে বনের রহস্য ভেদ করবার সাধ তাদের হয়, কিন্তু সাধ্য হয় না। কারণ শেষরাত্রে কাকপক্ষী ডাকবার আগেই নরেন্দ্র যখন বনে গমন করে, তখন তার প্রত্যেক বন্ধুই থাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

নবম

টুনুর পদক আর ভৈরবীর আঁমবটি

বাহন রুনু সেদিনও তাদের নিয়ে গিয়েছে বনের ভিতরে। একটি মস্ত কণ্টকিত কুলের ঝোপের সামনে নরেন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিল এবং টুনু খুব খুশিমুখে কোচড় ভরে পড়ছিল টা◌েপা কুল। রুনু একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবেই দেখছিল টুনুর কুল পাড়া। সে ওই কুলগাছের গুণ জানে। শুড়ের ডগায় কাঁটা ফুটলে যে কত আরাম হয়, সেটাও তার অজানা নয়। তাই মোটেই তার কুল খাবার লোভ হয় না।

রুনু যা ভয় করছিল তাই হল। হঠাৎ উঃ বলে মৃদু আর্তনাদ করে টুনু মাটির উপরে বসে পড়ল, তার হাতের আঙুলে বিঁধেছে কুলের কাটা। আঙুল দিয়ে রক্তও পড়ছে।

দেখি, দেখি, কী হল! বলে নরেন্দ্র তার কাছে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

টুনু হাসিমুখ উপর দিক তুলে বললে, কিছু হয়নি। একটা কাঁটা বিঁধেছিল। তুলে ফেলেছি।

হঠাৎ টুনুর গলার কাছে নরেন্দ্রের নজর পড়ল। খুব সরু একগাছা সোনার হারে গাঁথা একটি পদক কেমন করে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

নরেন্দ্র কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার গলায় ঝুলছে ওটা কী, টুনু? আরে, ওতে যে আবার কী একটা নাম লেখা রয়েছে! কই, দেখি, দেখি!

তাকে না বলে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে বলে টুনু পদকখানাকে গালাগাল দিতে লাগল। এটা আর কারুকে দেখাবার ইচ্ছা তার ছিল না। তবে, নরেন্দ্র যখন নেহাত দেখেই ফেলেছে, তখন লুকোবার আর কোনওই উপায় নেই।

নরেন্দ্র হেঁট হয়ে পড়ে সেই সোনার হার আর পদকখানা বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, এই গহন বনে এরকম হার আর সোনার পদক গড়ে এরকম স্যাকরা তো কেউ নেই! কাঠুরেদের কোনও মেয়ের গায়েই কখনও আমি এক টুকরো সোনার গয়নাও দেখিনি।

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝে টুনু চুপটি করে রইল।

নরেন্দ্র আবার বললে, পদকের উপরে একটি নাম লেখা দেখছি—রেণুকা। তোমার নাম তো টুনু। তোমার পোশাকি নাম কি রেণুকা?

মৃদুস্বরে টুনু শুধু বললে, হুঁ।

নরেন্দ্র বললে, রেণুকা খুব পুরোনো নাম, আবার খুব আধুনিকও। নামটি ভারী মিষ্টি। ও নাম তোমার কে রাখলে?

আমার মা-বাবা।"

দুখিরাম আর পার্বতী?

উঁহু!

তবে?

আমার সত্যিকার মা-বাবা।

নরেন্দ্র মহা বিস্ময়ে বললে, তোমার সত্যিকার মা-বাবা! সে আবার কারা?

আমি তাদের নাম জানি না।

নিজের মা-বাবার নাম জানো না!

খুব ছোটবেলায় আমি বনের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিলুম। সেই সময় রুনু আমাকে দেখতে পেয়ে ওই কাঠুরেপাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসে। তারপর থেকে ওইখানেই আমি মানুষ হয়েছি।

কতদিন পরে নরেন্দ্রর একটা মস্ত সমস্যার পূরণ হল। টুনুকে সে কোনওদিনই কাঠুরেদের মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। কাঠুরেদের ঘরে মানুষ হলেও তার সর্বাঙ্গে রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ।

আজ টুনুর মুখে আসল রহস্য জানতে পেরে নরেন্দ্রর সারা মন ভরে উঠল আনন্দে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, মা আর বাবার কথা তোমার মনে পড়ে?

একটু একটু পড়ে বই কি?

দেখতে তাঁরা কীরকম ছিলেন?

খুব ফরসা।

তারা কীরকম পোশাক পরতেন?

পোশাক আবার কীরকম পরতেন! মা পরতেন মেয়েদের মতো কাপড়। আর বাবাকে সব সময়েই দেখতুম, সায়েবদের মতন পোশাক পরে আছেন।

তুমি সাহেব দেখেছ?

হুঁ, এই বনে মাঝে মাঝে শিকার করতে আসে।

তোমার বাবা সেইরকম পোশাক পরতেন?

হ্যাঁ। বাবাকে মাঝে মাঝে তোমার মতো পোশাক পরতেও দেখতুম।

নরেন্দ্র বুঝলে, টুনু বলছে তার বাবা পরতেন তারই মতন খাকি রঙের প্যান্ট শার্ট।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, টুনুর বাবা সাধারণ হেটো লোকের মতো নয়।

সে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যখন হারিয়ে গিয়েছিলে, তখন তোমার বয়স কত?

এই পাঁচ-ছ-বছর হবে আর কী?

তাহলে তোমার বাড়ির ঠিকানাও নিশ্চয়ই তুমি জানো না?

না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে, এই বনের ধারেই কোথাও আমাদের বাড়ি। কারণ, আমি তো তখন খুব ছোট্টটি, হারিয়ে গেলেও বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে হেঁটে যেতে পারিনি।

নরেন্দ্র ভাবতে ভাবতে বললে, তোমরা কি পাকাবাড়িতে থাকতে?

হ্যাঁ, সেটা আমার মনে আছে। আরও মনে আছে যে, আমাদের বাড়ির চারিধারে ছিল চমৎকার একটি বেড়া দেওয়া বাগান। সেই বাগানটিতে রোজ আমি খেলা করতুম। আর খেলা করতে করতে একদিন প্রজাপতি ধরতে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই তো আমার এই সর্বনাশ! আমাকে হারিয়ে ফেলে আমার মা-বাবা নিশ্চয় কতদিন ধরে কত কেঁদেছেন। বলতে বলতে টুনুর দুটি ডাগর ডাগর চোখ ভরে উঠল অশ্রুজলে।

নরেন্দ্র তাকে সান্তনা দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, কেঁদো না টুনু। এই বনের ধারে ধারে চারিদিকে আমি খুঁজে দেখব। আমি নিশ্চয়ই তোমার আসল বাপমায়ের সন্ধান পাব।

টুনু বললে, তখনও হবে আমার আর এক জ্বালা! এই বনের মা-বাপকেও আমি যে ভালোবেসে ফেলেছি গো! এদের ছেড়ে যেতে দুঃখে আমারও বুক ফেটে যাবে, আর আমাকে ছেড়ে এরাও প্রাণে বাঁচবে না। কী করি বলো তো নরেন?

নরেন বললে, তোমার বাপ-মায়ের যেটুকু বর্ণনা শুনলুম, তাতে বোধ হয় তারা গরিব নন। দুখিরাম গরিব মানুষ, বনের কাঠ কেটে খায়। ওকে আর পার্বতীকে তুমি তো অনায়াসেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো। তোমাকে ফিরে পেলে খুশি হয়ে তোমার বাপমা নিশ্চয়ই ওদের আশ্রয় দেবেন।

এত সহজে এত বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল দেখে টুনু দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে নাচতে বললে, ওহো, কী মজা, কী মজা! ওরে রুনু, কী মজা! নরেন আমাকে বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে রে!

হঠাৎ নরেন মুখ তুলে দেখলে, কুল-ঝোপের ওপাশ থেকে সাঁৎ করে একদিকে সরে গেল একখানা কালো মুখ, আর চকচকে দুটো চোখ। ভালো করে মুখখানা দেখা গেল না বটে, কিন্তু সেটা যে মানুষেরই মুখ, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই লোকটার অভিপ্রায় ভালো নয়, নইলে আমন করে চোরের মতো গা-ঢাকা দেবে কেন? সে তখনই পিঠ থেকে বন্দুক নামিয়ে দ্রুতপদে

সেইদিকে ছুটে গেল। কারুকেই দেখতে পেলে না। কেবল লক্ষ করলে, খানিক তফাতে একটা ঝোপ দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে গেল। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে সে একবার বন্দুক ছুঁড়লে। তারপর আবার টুনুর কাছে ফিরে এল।

টুনু বিস্ময়-ভরে বললে, নরেন, ওদিকে তুমি ছুটে গেলে কেন? আর বন্দুকই বা ছুঁড়লে কেন?

নরেন্দ্র বললে, কে একটা লোক এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।

যে পালিয়ে গেল সে আর কেউ নয়, সে হচ্ছে রাঘব সর্দার। সে একজন বিখ্যাত ডাকাত। বনের বাইরে চারিদিকে ডাকাতি করে আবার সে ডুব মারে বনের ভিতরে। এই বনেই তার আস্তানা, পুলিশ এখানে এসে কোনওমতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারে না। রাঘব আজ পর্যন্ত কত লোককে যে খুন-জখম করেছে, তার আর কোনও হিসাব নেই। তার নাম শুনলেই এ-অঞ্চলে সকলেরই বুক মহা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তোমরাও রাঘবকে দেখেছ— সেই যেদিন নরেন্দ্র এসেছিল হরিণ শিকার করতে। টুনুর হুকুমে রুনু করেছিল তারই পিছনে তাড়া।

বনের ভিতর দিয়ে এ-পথ সে-পথ মাড়িয়ে রাঘব সর্দার এগিয়ে চলেছে হন হন করে। হিংস্র জন্তু-সংকুল এই বন্য দৃশ্যের মাঝখানে তার বন্য ও হিংস্র মূর্তিও মানিয়ে গিয়েছিল দস্তুরমতো। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হাঁটবার পর সে অরণ্যের একটা অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন অংশের ভিতরে প্রবেশ করলে। বাহির থেকে এখানে প্রবেশ করবার পথ আবিষ্কার করা অসম্ভব। এখান দিয়ে আনাগোনা করবার গুপ্ত পথ জানে কেবল রাঘব সর্দার ও তার চেলা-চামুণ্ডারা।

খানিকক্ষণ পরে বন আবার পাতলা হয়ে এল এবং সামনে দেখা গেল গাছ আর আগাছায় ভরা খানিকটা খোলা জমি। সেই জমির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু ছোটো একটা পাহাড় বা ঢিপি। তারই তলায়

কতকগুলো গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। সেইখানেই বাস করে দলবল নিয়ে রাঘব সর্দার।

একখানা বড়ো ঘরের দাওয়ার উপরে গিয়ে বসে পড়ে রাঘব তার হেঁড়ে গলায় ডাক দিলে, ওরে ভৈরবী?

ভিতর থেকে ঠিক ভাঙা কাঁশির মতো খনখনে ও নাকি আওয়াজ বেরিয়ে এল, কী বলছিস রে কর্তা?

রাঘব বললে, একছিলিম তামুক সেজে আন রে!

ভিতর থেকে আবার সেই আওয়াজ এল, আমার এখন হাত জোড়া। তামুক খেতে সাধ যায় তো নিজের হাতে সেজে খা!

রাঘব হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, তবে রে গতরখাকি মুটকি! দেখবি একবার মজাটা? জোড়া হাত খালাস করে এক্ষুনি তামুক সেজে নিয়ে আয়!

ভিতর থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। রাঘব নিজের কোমর থেকে রাঙা গামছাখানা খুলে মুখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বাতাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগল। এবং তার গলা পেয়ে এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েকজন গুণ্ডার মতন দেখতে লোক একে একে এসে দাওয়ার উপরে আসন গ্রহণ করলে।

একটা মাথায় খুব খাটো কিন্তু আড়ে খুব চওড়া লোক জিজ্ঞাসা করলে, কী খবর, সর্দার?

খবর ভালো। কিন্তু আমাদের আর বোধহয় সবুর করা চলবে না।

বেটকু বললে, কেন?

আজ বনের ভিতরে দেখলুম, রাজা ভূপেনের ছেলে সেই নরেন ছোকরা আর দুখিরামের মেয়ে টুনুকে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল নরেনের সঙ্গে টুনুর বোধহয় বিয়ে হতে আর দেরি নেই।

আর একটা লোক বললে, কাঠুরের মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের কখনও বিয়ে হয়? তাহলে নরেন কি সমাজে আর কল্কে পাবে?

রাঘব বললে, মটকু, যা জানিসনে তা নিয়ে আর তুই মাথা ঘামাসনে। আজকালকার সমাজের কী খবর রাখিস তুই? কখনও কলকেতায় গিয়েছিস? সেখানে আর কোনও জাত-বিচার নেই। বামুন বাবুসায়েবরা হাড়ি-বিবিসায়েবদের বিয়ে করলেও এখন সেখানে একঘরে হয় না। নরেন তো কলকেতার কলেজে পড়া ছেলে! তার টাকার ভাবনা নেই। সে যদি টুনুকে বিয়ে করে কলকেতায় চলে যায়, তাহলে এখানকার কেউ কিছুই করতে পারবে না।

বেঁটকু মাথা নাড়তে নাড়তে সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ সর্দার, এ কথা জজে মানে বটে।

মটকু বললে, তুমি এখন কী করতে চাও সর্দার?

দুখিরামের বেটি টুনটুনিকে ধরে আনতে চাই।

ধরতে চাও তো তাকে আজকেই ধরে আনলে না কেন?

তুই ব্যাটা হচ্ছিস হস্তীমুখ্যু! তার সঙ্গে নরেন ছিল বললুম না!

আরে, কী যে বলো সর্দার! নরেন কি আবার একটা মানুষ? তোমার এক চড়ে তার ঘাড় থেকে মাথা যাবে উড়ে!

কিন্তু আমি চড় মারবার আগেই সে যদি বন্দুক ছুড়ত!

দুই চক্ষু রসগোল্লার মতো গোল করে মটকু বললে, ও বাবা! তার হাতে আবার বন্দুক ছিল নাকি?

ছিল বলে ছিল! একটা গুলি চালিয়েও ছিল!

ছোড়া ভারী ধড়িবাজ তো!

কিন্তু কেবল কি বন্দুক? সেখানে ছিল সেই মস্ত হাতিটাও, টুনুর কথায় যেটা ওঠে বসে। বন্দুক এড়ালেও আমি সেই হাতিটাকে এড়াতে পারতুম না। তার সামনে টুনুকে ধরতে যাওয়া আর সোজা যমের বাড়ি যাওয়া একই কথা।

বেঁটকু বললে, তবেই আর তুমি টুনুকে ধরেছ!

আলবত ধরব। আমি ক-দিন ধরে তাদের উপর নজর রেখে দেখেছি, টুনু আর নরেন হাতিটাকে নিয়ে বনে বেড়াতে আসে কেবল সকালবেলাতে। তারপর হাতি, নরেন আর টুনু, যে যার নিজের বাসায় ফিরে যায়। আজই সাঁঝেরবেলাতে কাঠুরেদের গায়ে গিয়ে আমি টুনুকে ধরে আনব।

ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে এই কথা শুনছিল আর এক বীভৎস মূর্তি। সে হচ্ছে রাঘবের বউ ভৈরবী। অত মোটা স্ত্রীলোক চোখে পড়ে না বললেও চলে। ঠিক যেন একটা বটগাছের গুড়ির মতো তার দেহ। গায়ের রং অমাবস্যার ঘুটঘুটে রাত্রিকেও হার মানায়। বাঁদরের মতো থ্যাবড়া নাক, কাফ্রিদের মতো পুরু ঠোঁট, একটা ঠোট আবার কাটা। আর সেই কাটার ফাঁক দিয়ে গজদন্তের মতো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে একটা বিবর্ণ দাঁত। সেই কালো মুখের থেকে খুব কুতকুতে চোখদুটো তার জ্বলে জ্বলে উঠছে সাপের চোখের মতো। যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী!

বাইরে বেরিয়ে এসেই সেই পেত্নির মতো নাকি খনখনে গলায় ভৈরবী বলে উঠল, দুখিরামের মেয়েকে নিয়ে তুই কী করবি রে কর্তা?

হলদে দাঁতের পাটি বার করে রাঘব করল একটা বিকট মুখভঙ্গি। এখানকার সকলে সেই ভঙ্গিটাকে হাসি বলেই ধরে নেয়। অতএব আমরাও তাকে হাস্য বলেই গ্রহণ করব।

হাসতে হাসতে চোখ মটকে রাঘব বললে, বিয়ে করব।

যাঁহাতক এই কথা বলা, ভৈরবী অমনি হুকোর উপর থেকে আগুন-ভরা কলকেটা তুলে নিয়ে সজোরে প্রেরণ করলে রাঘবের মস্তকদেশের দিকে। তার রায়বাঘিনী গৃহিণীর কাছ থেকে এই রকম ব্যবহারের প্রত্যাশা করত সর্বদাই রাঘব। কাজেই আজও সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, ধাঁ করে মাথা নামিয়ে ফেলে কলকেটাকে সে কোনওমতে এড়ালে। কিন্তু জ্বলন্ত টিকেগুলোর প্রত্যেকটিকে সে এড়াতে পারলে না; কোনও-কোনওটা গিয়ে পড়ল তার গায়ের উপরে। আঁতকে

গা আর কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে মারমুখো হয়ে সে বললে, কী করলি রে হতচ্ছাড়ি?

ডান হাতে হুঁকোর নলচেটা ধরে নীচের দিকটা গদার মতন উপর দিকে তুলে রাঘবের মুখের সামনে গোদা বাঁ হাতখানা নাড়তে নাড়তে হুমকি দিয়ে ভৈরবী বললে, বেশি কথা কয়েছিস কী, এই হুঁকোটা ভেঙেছি তোর মাথার ওপর।

গিন্নিকে আরও ঘটিয়ে এই হুঁকোটা থেকে বঞ্চিত হবার ইচ্ছা রাঘবের হল না। মনের আক্রোশ মনেই চেপে সে বললে, তোর এতটা রাগের কারণ কী রে হতভাগী?

কারণ নেই? কেন তুই বললি, দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করবি?

কেন, বিয়ে করতে দোষটা কী!

তোর জলজ্যান্ত বউ আমি না এখনও বেঁচে আছি!

রাঘব অট্টহাস্য করে বললে, আমাকেও তুই হাসালি ভৈরবী!

তা, হাস না, একটু হাস না! ও পোড়ার মুখে একটু তবু হাসি দেখলেও এই বেঁটকু আর মটকুদের মনটা কিছু ঠান্ডা হবে।

রাঘর বললে, হিঁদুদের শাস্তরে আছে, পুরুষমানুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারে। আমি হিঁদু, আমিও একটার ওপরে দুটো বিয়ে কেনই বা করব না!

আমার ঘরে সতীন এনে মজাটা একবার দেখ না!

রাঘব তখন যুক্তির আশ্রয় নিলে। বললে, ভৈরবী, খামকা মাথা গরম করিসনি, যা বলি, মন দিয়ে শোন। তোর মনে আছে কি, নরেনের বাপ রাজা ভূপেন একবার পাইক পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে দিয়েছিল, আর আমার জেল খাটবার হুকুম হয়েছিল পনেরো বছর! ভাগ্যে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এক বছর জেল খেটেই লম্বা দিতে পেরেছি, নইলে আজও আমাকে সেইখানে পচে মরতে হত। রাজা ব্যাটা পটল তুলেছে, কাজেই আমি ছেলের ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চাই। তার ওপরে ওই নরেন ছোকরার সঙ্গে

প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়েছিল, সেইদিনই আমাকে অপমান করতে ছাড়েনি। তারপর আজকেও সে আমাকে মারবার জন্যে বন্দুক ছুড়েছিল। তবে নরেনকে আমি মাপ করব কেন রে?

দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করলে নরেনের ওপরে কী প্রতিশোধ তোলা হবে?

রাঘব বললে, মুটকি, তোর কী মোটা বুদ্ধি রে! এটাও বুঝতে পারছিস না, নরেন ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়! আমি যদি তাকে ছিনিয়ে এনে বিয়ে করে ফেলি, তাহলে নরেন কী জব্দটাই না হবে!

কিন্তু ভৈরবী বোঝ মানবার পাত্রী নয়। সে এই বলে গজরাতে গজরাতে ঘরে ঢুকল— সতীন আনবি? আন না দেখি! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না।

সেই সন্ধ্যায়।

সূর্যদেব অস্তচলে নেমে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত কিরণ-তিরের অগ্রভাগগুলি যেন ভেঙে তখনো আবছায়ায়-ঝাপসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এখনও জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে দিবসের সমুজ্জ্বল স্মৃতিটুকু। আকাশের অন্তরালে তারকাবালারা বোধহয় সাজসজ্জায় ব্যস্ত ছিল, কারণ এখনও তারা ঘোমটা খুলে দেয়নি। বিহঙ্গেরা সব কুলায়ে ফিরে গিয়ে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে, কারণ রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে এই গহন অরণ্যে। শৃগাল-সভায় শোনা গেল একবার হুক্কাহুয়ার লেকচার। তখনও দুয়েকটা পথ-ভোলা বাছুর হাম্বা হাম্বা চিৎকার করে অদৃশ্য মাতাদের সন্ধানে জানাচ্ছে কাতর প্রার্থনা।

দুখিরাম বললে, পার্বতী, আমাদের বাছুরটা পাশের মাঠে এখনও বাঁধা রয়েছে।

পার্বতী তখন সবে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে তুলসীগাছের তলায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে উঠেছে। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, একটু পরেই তো হুমড়োরা বেরিয়ে পড়বে দাঁড়াও তাকে আমি নিয়ে আসি ।

টুনু বললে, না মা, তুমি রান্নাঘরে যাও, উনুন জ্বলে যাচ্ছে। বাছুরটাকে আমিই নিয়ে আসি।

বনের মেয়ে টুনু, ধীরে ধীরে চলতে শেখেনি। ছোট্ট বালিকার মতো সকৌতুকে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এবং দাওয়া থেকে লাফিয়ে মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর তেমনি ছুটতে ছুটতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল একদিকে।

বাড়ির পিছনকার মাঠে একটা গাছের গোড়ায় বাছুরটা ছিল বাঁধা। সে মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে কাতর স্বরে ডেকে উঠছিল ঘন ঘন।

বাছুরটার নাম ছিল মধু। গাছের গোড়া থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে আদর-মাখা মিষ্টি গলায় টুনু বললে, হ্যাঁরে মধু, মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খেতে চাস বুঝি?

মধু তার হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে যা বলতে চাইলে টুনু তার কিছুই বুঝতে পারলে না। সে বললে, বাবারে বাবা, একফোটা বাছুর, তার গলার আওয়াজে কানের পোকা বেরিয়ে যেতে চায় যে! হারে মধু—

কিন্তু এর বেশি আর সে কিছু বলতে পারলে না। কারণ পিছন দিক থেকে হঠাৎ দুখানা বলিষ্ঠ ও কর্কশ হাত এসে তার মুখ করে দিলে একেবারে বোবা! অন্ধকারের ভিতর থেকে আরও চার-পাঁচটা যেন অন্ধকার-মাখা মূর্তি আকস্মিক শরীর বিস্ময়ের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ চেপে ধরলে তার হাতদুটো, কেউ ধরলে তার দুটো পা। পরমুহূর্তে টুনু অনুভব করলে, সে এখন অবস্থান করছে শূন্যে। তারপর তারা তাকে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে চলল কোনও একদিকে। সে এখন একান্ত অসহায়, এমনকি, তার চিৎকার করবারও উপায় নেই।

তারা ছুটে চলেছে বন-বাদাড় ভেঙে, অত্যন্ত সহজে অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করে। টুনু এইটুকু বুঝতে পারলে, অন্ধকারের ভিতরেও যারা অনায়াসে

দুর্ভেদ্য বনের মধ্যেও নিজেদের পথ করে নিতে পারে, তারা নিশ্চয়ই এখানকারই লোক। পথঘাট দেখবার জন্যে তাদের দরকার হয় না চোখ। অবাধে তারা এগিয়ে চলেছে তো এগিয়ে চলেছেই। কিন্তু কে এরা? তাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বন্দিনী করতে পারে, এই বনে এমন কোনও লোকেরই কথা তার মনে পড়ল না। কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন তারা?

তারা অনেকখানি পথ পার হয়ে গেল। রাত্রি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে গভীরতার দিকে। অন্ধকার ক্রমে হয়ে উঠছে নীরন্ধ্র। আকাশে উড়ছে ডানার শব্দে চারিদিক শব্দিত করে রাত্রির দূত বাদুড়েরা। গাছে গাছে শোনা যাচ্ছে পেচক ভাষায় কর্কশ আবৃত্তি। বনের সমস্ত গাছপালা যেন নিমগ্ন হয়ে গেছে কালিমার মহাসাগরে। কাছে-দূরে, বনে বনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে রক্তলোভী, বুভুক্ষু হিংস্র নিশাচরেরা। চারিদিক ভয় ভয়। চারিদিকে যেন মূর্তি ধারণ করতে চেষ্টা করছে অদৃশ্য ছায়াচরেরা। চারিদিকে বিরাজ করছে একটা থমথমে ভাব। কারা যেন কাদের হত্যা করতে চায়, কারা যেন চায় কাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গাছের পাতায় পাতায় জাগছে যেন মৃত্যু-প্রলাপ। টুনুর সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ভোরের আলোয় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দেখেছে সে হাস্যময়ী উজ্জ্বলা প্রকৃতিকে। কিন্তু রাত্রে যে অরণ্যের অন্তপুর এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, বনবাসিনী হয়েও এ ধারণা সে কোনওদিনই করতে পারেনি।

থেকে থেকে এখানে-ওখানে জেগে উঠছে ব্যাঘ্রদের হিংসার হুঙ্কার। খুব কাছেই হঠাৎ একবার ডেকে উঠল ফেউ।

কিন্তু টুনুকে যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা যেন এ সব বিভীষিকাকে একেবারে গ্রাহ্যের ভিতরে আনতে চায় না। তারা তবু ছুটছে আর ছুটছে আর ছুটছেই।

কেবল ফেউ ডাকবার পর একজন ছুটতে ছুটতেই বললে, কাছেই ফেউ ডাকছে। বোধহয় কোনও ব্যাটা বাঘের নজর পড়েছে আমাদের দিকেই। একসঙ্গে

এতগুলো খাবারের লোভ বোধহয় সে সামলাতে পারেনি। হ্যাঁরে বেঁটকু, সর্দারের বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিস তো?

আর একজন বললে, মটকু তোর চোখদুটো কি কানা? তোর সঙ্গেই এসেছি, আমার হাতে এত বড়ো একটা বন্দুক রয়েছে তাও দেখতে পাসনে? দূর ব্যাটা, বোকারাম কোথাকার।

মটকু খাপ্পা হয়ে বললে, ধরলুম, আমার চোখ না হয় কানা, কিন্তু কানা হলেই কেউ আবার রোকারাম হয় নাকি? তুই রাসকেল হচ্ছিস গাধার চেয়েও মুখ্যু।

আর একজন কে বললে, হ্যাঁরে মটকু, ছুড়ির মুখটা এখনও ভালো করে চেপে আছিস তো? সর্দার কী বলে দিয়েছে মনে আছে? যতক্ষণ না আড্ডায় গিয়ে পৌঁছতে পারো, ছুঁড়ি যেন একবারও চেঁচাবার ফাঁক না পায়। এই বনের কোনও বুনো হাতি নাকি একেবারে ওর পোষা কুকুরের মতন হয়েছে। ওর চিৎকার একবার শুনতে পেলেই সে এক্ষুনি ছুটে এসে আমাদের সকলকার ঘাড় মট মট করে মটকে দিতে পারে।'

মটকু রেগে বললে, যাঃ যাঃ, ভ্যাবাগঙ্গারাম কোথাকার! তোকে আর শেখাতে হবে না!

খানিকক্ষণ আর কেউ কোনও কথা কইলে না। ক্রমে ধীরে ধীরে তাদের গতি হয়ে এল মন্থর, তারা হাঁটতে লাগল সাধারণ ভাবেই। অল্পকাল পরেই হঠাৎ তারা একটা ফরসা জায়গার উপর এসে দাঁড়াল। টুনুর চোখ খোলা ছিল, উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে, আর সেখানে গাছের ডাল নেই, রয়েছে কেবল হাজার হাজার চুমকি বসানো মুক্ত কালো আকাশ। একটু তফাতে রয়েছে কীসের একটা উঁচু ছায়া, বোধহয় সেটা কোনও ছোটো পাহাড়। এই পাহাড়ের নীচের দিকে টিমটিম করে জ্বলছে গোটা-তিনেক আলো, বোধহয় ওখানে মানুষের ঘর-টর কী আছে।

যারা টুনুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেই আলোর দিকে খানিকটা অগ্রসর হতেই কে বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, কী রে মটকু, কেল্লা ফতে তো?

মটকু উত্তর দিলে, সর্দার, শিকার ধরে এনেছি!

'জয় মা কালী' বলে রাঘব সর্দার আহ্লাদে চিৎকার করে উঠল—কিন্তু টুনু শুনলে সে যেন একটা হিংস্র জানোয়ারের গর্জন।

একটু পরেই লোকগুলো টুলুকে নামিয়ে একটা ঘরের দাওয়ার উপরে বসিয়ে দিলে। দাওয়ার এক কোণে জ্বলছিল একটা হারিকেনের স্নান আলো, তার দুর্বল শিখা অন্ধকারকে দূর করতে পারছিল না। টুনু মুখ তুলেই সামনেই যে বিপুল যমদূতের মতো মূর্তিটা দেখলে, সে তার অপরিচিত নয়। তার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠল। তবু সে বাইরে মনের ভাব প্রকাশ না করে স্থিরভাবে বসে রইল মৌন মূর্তির মতো।

রাঘব কড়া গলায় চড়া স্বরে বলল, কী গো দুখিরামের মেয়ে, আমাকে চিনতে পেরেছ?

পেরেছি।

তাহলে সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?

হ্যাঁ আছে।

আমার পিছনে সেদিন তুমি একটা বুনো হাতি লেলিয়ে দিয়েছিলে, তাও ভোলনি তো?

এত শিগগির ভুলে যাব কেন? রুনু এখানে থাকলে তোমার পেছনে আজও তাকে লেলিয়ে দিতুম।

রাঘব হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর হাসি না থামিয়েই বললে, দিতিস নাকি? তাহলে একবার সেই চেষ্টাই করে দেখ না?

রুনু যখন আমাকে এখানে এসে খুঁজে বের করবে তখন নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করব।

রাঘব চকিত স্বরে বললে, সেই হাতিটা এখানে তোকে খুঁজতে আসবে?

নিশ্চয়ই আসবে। আমার জন্যে রুনু সারা বন তোলপাড় না করে ছাড়বে না, এ আমি ভালো করেই জানি।

রাঘব মুখে কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার উৎফুল্ল ভাবটা যেন বেশ খানিকটা জখম হল।

তার মনের ভাব বুঝে মটকু বললে, সর্দার, মেয়েটার বাজে কথায় তুমি কান দিয়ো না। হাতিটা আমাদের আড্ডার খোঁজ পাবে কী করে? এদিকে কখনও আমরা কোনও হাতিটাতি আসতে দেখিনি। হাতিরা এদিকটা চেনেই না।

রাঘব খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, যা বলেছিস! দুখিরামের মেয়েটা আমাকে ভয় দেখাতে চায়। দাঁড়া না, ওর জাঁক আমি ভেঙে দিচ্ছি। বেঁটকু, কালকেই তুই কাছাকাছি কোনও গায়ে গিয়ে একটা পুরুত ডেকে আনিস তো!

সঙ্গে সঙ্গেই সকলকার কানে ধাক্কা মেরে সেখানে যেন বেজে উঠল একখানা ভাঙা কাঁসি।

টুনু সচকিত চোখ ফিরিয়ে দেখে, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যেন দশমহাবিদ্যার মাতঙ্গীর মতো এক চেহারা। মেয়েমানুষের চেহারা যে এমন হয়, সে তা জানত না।

সে এসেই চোখ পাকিয়ে বললে, কেন, পুরুত ডেকে এনে হবে কী? তোর শ্রাদ্ধ?

রাঘব একটু যেন দমে গেল। দুই পা পিছনে হটে গিয়ে কেবল বললে, ধর, তাই।

তাই নাকি! তাহলে শুনে রাখ, শ্রাদ্ধ যদি হয় তাহলে সে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে, এও আমি বলে রাখছি কিন্তু, হুঁ!

রাঘব অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললে, আচ্ছা আচ্ছা, পরে তা দেখা যাবে।

ভৈরবী ফিরে হুমকি দিয়ে ডাকলে, বেঁটকু!

বেঁটকু ভয়ে ভয়ে বললে, এঁজ্ঞে!

তুই যদি পুরুত ডাকতে যাস, তাহলে তোর নাকটা আর মুখের ওপর থাকবে না। আমার আঁশবঁটিতে খুব ধার আছে, তা জানিস তো!

বেঁটকু চোখ নামিয়ে নিজের নাকের ডগাটা দেখবার চেষ্টা করে বললে, এঁজ্ঞে!

দশম

রাঘব ও রুনু

পরদিনের প্রভাত।

সূর্যের কচি আলো দুখিরামের দাওয়ায় প্রবেশ করে দেখলে, মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পার্বতী থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠছে এবং দাওয়ার এক কোণে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দুখিরাম বসে আছে জড়ভরতের মতো।

কাল সারা রাত ধরে কেঁদে কেঁদে কেঁদে পার্বতীর চোখের পাতা উঠেছে ফুলে ও চোখদুটো হয়ে উঠেছে রাঙা টকটকে। দুখিরাম কাঁদছে না বটে, কিন্তু তার বুকের ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। বেলা ক্রমে বাড়তে লাগল, কিন্তু তারা দুজনে শুয়ে আর বসে ঠিক সেই একভাবেই। কাল রাত্রেও অন্ন তাদের উদরস্থ হয়নি, আজও যে রান্নাবান্না হবে এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

নির্দিষ্ট সময়ে রুনু এসে দাঁড়াল তাদের ঘরের দাওয়ার সামনে। তাকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসে পার্বতী চেঁচিয়ে কেঁদে বলে উঠল, ওরে রুনু, ওরে রুনু, তোর টুনু আর নেই রে, তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে!

রুনু কী বুঝলে জানি না, কিন্তু পার্বতীর এই কান্না শুনে তার চোখদুটো উঠল চমকে। পার্বতীকে সে কোনওদিন কাঁদতে দেখেনি, আর এখানে টুনুর অনুপস্থিতিও তার কাছে বোধহয় অস্বাভাবিক বলেই বোধ হল। হয়তো সে স্থির করতে পারলে, টুনুর অনুপস্থিতির সঙ্গে পার্বতীর এই কান্নার একটা সম্পর্ক আছে। সে একবার শুড় তুলে চিৎকার করে উঠল—সম্ভবত সে ডাকলে টুনুকেই। কিন্তু তবু টুনুর সাড়া বা দেখা পাওয়া গেল না।

পার্বতী আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, কাকে ডাকছিস রুনু! আমার টুনু কি আর এই দুনিয়ায় আছে! ওগো, আমার কী হবে গো! টুনুকে ছেড়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব গো।

হঠাৎ ভেঙে গেল দুখিরামেরও স্তব্ধতার বাঁধ। মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে-ও ভগ্নস্বরে হাহাকার না করে আর থাকতে পারলে না।

রুনু অধীর ভাবে একবার ওদিকে ছুটে যায়, আবার এদিকে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কী-একরকম চোখে দুখিরাম আর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় বেলগাছের পাশের সেই ঝোপটার কাছে হল নরেন্দ্রর আবির্ভাব। টুনুর বদলে সে কেবল দেখতে পেলে রুনুকে, আর শুনতে পেলে দুখিরাম ও পার্বতীর চিৎকার করে কান্না। সে কেমন থতোমতো খেয়ে গেল, অজানা একটা আতঙ্কে তার বুকের কাছটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রুনু একলা কেন! টুনু কোথায় গেল! দুখিরাম আর পাবর্তী অমন করে কাঁদছে কেন!তার মনের ভিতরে ক্রমাহত আনাগোনা করতে লাগল এই তিনটে প্রশ্নই। শেষটা কিছুই বুঝতে না পেরে সে পায়ে পায়ে টুনুদের ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে খনখনে গলায় কে ডেকে উঠল, ওগো বাবু, শুনছ? বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়াল নরেন্দ্র। এবং অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলে, ভয়াল চেহারার একটা স্ত্রীলোক খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নরেন্দ্র বললে, তুমি কি আমাকে ডাকছ?

মুখে কিছু না বলে স্ত্রীলোকটা তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে আসতে বললে।

অবাক হয়ে তাকে দেখতে দেখতে নরেন্দ্র তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটা বললে, তুমি কে গা বাবু?

নরেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়ে বললে, তা জেনে তোমার দরকার?

দরকার আছে বাবু, খুব বেশি দরকার আছে! তা নইলে কি শুধু শুধুই জিজ্ঞেস কচ্ছি?

আমার নাম নরেন।

ও, তুমিই বুঝি রাজাবাবুর ব্যাটা?

নরেন খালি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

তোমাকেই তো আমার বেশি দরকার!

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে নরেন্দ্র বললে, তোমার দরকার আমাকে!

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমাকেই!'

কেন?

স্ত্রীলোকটা অল্প একটু ইতস্তত করলে। তারপর বললে, তুমি দুখিরামের বেটিকে দেখতে চাও?

টুনুকে!

তা হবে, বোধহয় তারা নাম তাই।

হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি!

কিন্তু তার দেখা তুমি এখানে পাবে না।

পাব না মানে?

দুখিরাম আর তার বউয়ের মড়াকান্না শুনেও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে টুনু এখানে নেই?

নরেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটু নীরব থেকে বললে, টুনুর কোনও অনিষ্ট হয়নি তো?

এখনও হয়নি, কিন্তু হতে আর কতক্ষণ?

সে আবার কী?

টুনু এখন পড়েছে রাঘব-বোয়ালের পাল্লায়।

নরেন্দ্র হতভম্বের মতো বললে, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাঘববোয়ালটা কে শুনি?'

রাঘব সর্দারের নাম শুনেছ?

শুনেছি। একদিন বনের ভিতরে তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। তুমি রাঘব ডাকাতের কথা বলছ তো?

হ্যাঁ।

সে কী! টুনু রাঘব ডাকাতের পাল্লায় গিয়ে পড়ল কেমন করে?

কাল রাতে টুনুকে তারা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

ব্যস্ত ভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ধরে নিয়ে গিয়েছে?

তাদের নিজেদের আস্তানায়।

কোথায় তাদের আস্তানা?

এই বনেই।

তুমি তার ঠিকানা জানো?

জানি।

আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

পারব। তোমাকে নিয়ে যেতেই তো আমি এসেছি!

তাহলে এখনই আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

স্ত্রীলোকটা নড়ল না। বললে, তুমি একলা সেখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। রাঘবের দলে আট-দশ জন লোক আছে।

বেশ, সে ব্যবস্থাও করছি। কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কী?

স্ত্রীলোকটা এতগাল হেসে বললে, আমি? আমি রাঘবের বউ গো! আমার নাম ভৈরবী।

চমকে উঠে বিস্ফরিত চক্ষে ভৈরবীর মুখের পানে নরেন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই মুহূর্ত। তারপর তাড়াতাড়ি বললে, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি। বলেই সে দুখিরামের ঘরের দিকে রুনু, রুনু, রুনু বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এগিয়ে গেল। তার ডাক শুনে রুনু তখনই কান খাড়া করে ফিরে দাঁড়াল।

তাকে দেখে দুখিরাম দাঁড়িয়ে উঠে করুণ স্বরে বললে, রাজাবাবু, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে গো! টুনু আর বেঁচে নেই?

নরেন্দ্র বললে, কোনও সর্বনাশ হয়নি, টুনু বেঁচে আছে। তার খবর আমি পেয়েছি। তোমরা আর কেঁদো না। আমি এখনই টুনুকে আনতে চললুম।

তারপর সে রুনুর গা চাপড়াতে চাপড়াতে সস্নেহে বললে, রুনু, আমি টুনুকে আনতে যাচ্ছি, বুঝেছিস? টুনু রে, তোর টুনু! শিগগির আমার সঙ্গে আয়, তুই না গেলে আমি টুনুকে আনতে পারব না। আয়—

রুনু ঠিক বুঝতে পারলে। আর কোনও রকম ইতস্তত না করেই সে এগিয়ে চলল নরেন্দ্রর পিছনে পিছনে।

নরেন্দ্রের সঙ্গে অত বড়ো একটা হাতিকে আসতে দেখে ভৈরবী অত্যন্ত ভয় পেয়ে ঝোপের ভিতরে লুকোবার চেষ্টা করলে।

নরেন্দ্র বললে, তোমার কোনও ভয় নেই। এ তোমাকে কিছু বলবে না। আমি আর টুনু যা বলি, এই হাতি তা শোনে। তুমি নির্ভয়ে আমাদের আগে আগে এগিয়ে পথ দেখিয়ে চলো।

ভৈরবী নরেন্দ্রের কথা মতো অগ্রসর হল বটে, কিন্তু যেতে যেতে বারবার সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিত ভাবে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগল।

চলল আবার তারা বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে। সূর্যের আলোতে অরণ্য এখন জ্যোতির্ময়, দুঃস্বপ্ন-মাখা রাত্রির কালো অভিশাপ কোনওখানেই আর জেগে নেই। পেচক আর বাদুড়দের কথা পৃথিবী এখন ভুলে গিয়েছে, তাদের বদলে দিকে দিকে বসেছে গানের পাখিদের সভা।

রাত্রে যাদের আনন্দ, দিনে তাদের প্রাণে জাগে আতঙ্ক। কাল রাত্রে বিপুল বিক্রমে যারা গাইছিল মৃত্যুর সংগীত, দিনের আলোয় এখন আর তারা বাইরে মুখ বাড়াবার ভরসা করছে না।

রুনুর মনের ভিতরে এখন কোনও ভাবের প্রভাব তা আমরা জানি না, কিন্তু নরেন্দ্রের মনের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল ভীষণ আক্রোশ ও দারুণ ক্রোধ।

সে বেশ বুঝলে, টুনু সেদিন রুনুকে রাঘবের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল বলেই আজ সে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই রাঘবের নাম শুনে আসছে সে লোকের মুখে মুখে। তার অমানুষিক অত্যাচারে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে নাকি একবার জুলন্ত আগুনের ভিতরে এক পরিবারের দশজন লোককে জীবন্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তাদের অপরাধ, তারা গুপ্তধনের সন্ধান দেয়নি। ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের মন বিদ্রোহী হয়ে আছে রাঘবের বিরুদ্ধে। তার উপরে রাঘবের আজকের এই অপরাধ। এর আর মার্জনা নেই। নরেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে, টুনুকে তো উদ্ধার করবেই, সেই সঙ্গে রাঘবকেও সে দিয়ে আসবে চরম শিক্ষা। রাঘবকে আজ হত্যা—অন্তত বন্দি করতে পারলেও এ অঞ্চলের গৃহস্থেরা মস্ত একটা দুঃস্বপ্নের কবল থেকে নিস্তার লাভ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

অনেকক্ষণ পথ চলবার পর তারা একটা মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল। দূরে একটু তফাতে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা পাহাড়, আর তার তলায় রয়েছে সারি সারি ছাউনি-বাঁধা ঘর। ভৈরবী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, বাবু, আমি আর যেতে পারব না।

কেন?

আমিই যে তোমাকে দুখিরামের মেয়ের কথা বলে দিয়েছি, এটা জানতে পারলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে।

কী মুশকিল! অন্তত রাঘবের আস্তানাটাও দেখিয়ে দেবে তো?

সামনের দিকে হস্ত বিস্তার করে ভৈরবী বললে, ওই ঘরগুলোর ভিতরে ওরা থাকে।

আয় রুনু! বলে নরেন্দ্র আবার এগুতে উদ্যত হল, কিন্তু ভৈরবী হঠাৎ আবার কাতর স্বরে বললে, আর একটা কথা, বাবু!

কী কথা?

আর যা করো বাবু, তাকে প্রাণে মেরো না। হাজার হোক সে তো আমার সোয়ামি। সে মরলে আমার সিঁথের সিঁদুর ঘুচবে, আর হাতের নোয়াও থাকবে না।

ভৈরবী যে দানবের যোগ্য দানবী সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই; কিন্তু তারও মনে এখনও যে পতিভক্তির অঙ্কুর আছে, এটুকু বুঝে নরেন্দ্র হল বিস্মিত। কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা এনে সে বললে, দ্যাখো ভৈরবী, তোমাকে আমি জোর করে এখন কোনও কথা দিতে পারব না। রাঘব যদি টুনুর কোনও অনিষ্ট না করে থাকে আর আমার কাছে ভালো মানুষের মতো ধরা দেয়, তাহলে তার কোনওই প্রাণের ভয় নেই। তাকে বন্দি করব বটে, তবে প্রাণে মারব না। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ ও কোনও শয়তানি করলে রাঘবের অদৃষ্টে কী আছে কেবল ভগবানই জানেন –আয় রুনু!

পিঠের বন্দুক হাতের উপরে নিয়ে নরেন্দ্র অগ্রসর হতে লাগল দৃঢ়পদে। তার ভাবভঙ্গি দেখেই রুনু বোধহয় বুঝতে পারলে, আজ এখানে তাদের অভিনয় করতে হবে বিশেষ কোনও নাটকীয় দৃশ্যে। হঠাৎ সে খুব জোরে একবার চিৎকার করে উঠল।

তারা তখন মাঠের তিন ভাগ পার হয়ে এসেছে, আর একভাগ মাত্র বাকি। পাহাড়ের তলাকার ঘরগুলোয় যারা বাস করে, হাতির ডাক শুনেই তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উঠল একটা হই হই রব। কালো কালো কয়েকটা মূর্তি এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। তারপরেই হল একটা বন্দুকের শব্দ।

রুনু বেচারির একটা কান ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল একটা তপ্ত গুলি। সে চেঁচিয়ে উঠল রাগে আর যাতনায়। নরেন্দ্রও বন্দুক ছুড়তে দেরি করলে না—উপর উপরি দু-দু-বার। ওদিকে জেগে উঠল মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে একটা বিকট আর্তনাদ। পরমুহূর্তেই ঘরের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো মূর্তিগুলো।

তারপরেই শোনা গেল একটা অতি কাতর তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ। রুনু ও নরেন্দ্র দুজনেই বুঝলে, এ কান্নার শব্দ আসছে টুনুর কণ্ঠ থেকে।

রুনু নিজের সমস্ত যন্ত্রণার কথা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল। দুই কর্ণ দুইদিকে বিস্তৃত ও শুণ্ড উর্ধ্বে উত্তেলিত করে সে ঝড়ের মতো বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলল সেই ঘরগুলোর দিকে। তার দিকে তাকালেও প্রাণ এখন শিউরে ওঠে, সে যেন এখন সাক্ষাৎ এক সংহারমূর্তির মতো! বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে নরেন্দ্রও ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

তারা যখন ঘরগুলোর খুব কাছে এসে পড়েছে তখন আবার শোনা গেল টুনুর উচ্চ কণ্ঠস্বর: রুনু, রুনু! এরা আবার আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তুমি শিগগির এসো রুনু! সেইখান থেকেই দেখা গেল, একদল লোক সার বেঁধে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরের দিকে। নরেন্দ্র আবার দু-বার বন্দুক ছুড়লে। একটা লোক পাহাড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ শূন্যে দুই হাত ছড়িয়ে নীচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকেও বন্দুকের আওয়াজ হল, কিন্তু রুনু বা নরেন্দ্রের গায়ে কোনও গুলিই লাগল না।

রুনু আরও জোরে ছুটে চলল—যাকে বলে উল্কা-বেগে! হাতি যে অত বড়ো দেহ নিয়ে এত বেগে ছুটতে পারে, নরেন কোনও দিনও তা কল্পনা করতে পারেনি। সে খুব তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল, কিন্তু রুনুর নাগাল ধরতে পারলে না কিছুতেই। তাকে অনেক পিছনে ফেলে বৃংহিতধ্বনি করতে করতে সুমুখের ঘরগুলোর কাছে মোড় ফিরে রুনু চলে গেল চোখের আড়ালে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, সে-ও উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপর দিকে।

পাহাড়ের তলায় এসে পড়ে নরেন মানুষ কি টুনু, কারুকেই আর দেখতে পেলে না। কেবল সামনে পেলে উপরে উঠবার একটা পথ। তাড়াতাড়ি বন্দুকে আবার টোটা ভরে নিয়ে সে-ও অবলম্বন করলে পাহাড়ে পথটা।

আগেই যথা সময়ে বলা হয়েছে, এটা একটা ঢিপির মতো পাহাড়। তিনতলা বাড়ির চেয়ে বেশি উঁচু হবে না। তার উপরে কতকগুলো বড়ো বড়ো ঢাঙা গাছ ছিল বলে দূর থেকে পাহাড়টাকে আরও কিছু বেশি উঁচু দেখায়।

নরেন যখন প্রায় পাহাড়ের টঙে গিয়ে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ সে রোমাঞ্চিত দেহে শুনতে পেলে নানা মানুষের কণ্ঠস্বরে আকাশ-ফাটানো চিৎকারের পর চিৎকার, এবং সেইসঙ্গে একবার বন্দুকের গর্জনও। রুদ্ধশ্বাসে সে পাহাড়ের চূড়ার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দৌড়ে সামনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে, পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে যা দর্শন করলে তা হচ্ছে এই তার দিকে পিছন ফিরে পাহাড়ের মাঝ-বরাবর দাড়িয়ে আছে রুনুর ক্রোধস্ফীত বিশাল দেহ, এবং তার পিঠের উপরে সুন্দর একটি জীবন্ত পুতুলের মতন বসে আছে টুনু।

রুনুর দেহের এপাশে-ওপাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা রক্তাক্ত মনুষ্যদেহ। কোনও কোনও দেহ তখনও ছটফট করছে, এবং কোনও-কোনওটা একেবারে আড়ষ্ট।

নরেন্দ্র আবার ছুটে নীচের দিকে নেমে গেল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে তার আধ মিনিটও লাগল না।

রুনুর কাছে গিয়েই নরেন্দ্র সানন্দে ডাকলে, টুনু! আমার টুনু!

টুনু মুখ ফিরিয়ে মধুর হাসি হেসে বললে, কী, নরেন?

তোমার গায়ে কোথাও লাগেনি তো?

কিছু লাগেনি। রুনু এসে প্রথমেই আমাকে শুড় দিয়ে পিঠের উপরে তুলে নিয়েছিল। তারপর যা কাণ্ড! দেখতেই পাচ্ছ তো!

নরেন্দ্র কৃতজ্ঞ কণ্ঠ ডাকলে, রুনু!

রুনু ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। টুনুকে পেয়ে তার মূর্তি এখন শান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার শুড়ে জড়ানো কী ওটা? ভালো করে সেদিকে তাকিয়েই ভয়ার্ত বিস্ময়ে নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি পিছিয়ে দাঁড়াল।

রুনুর শুড়ের কুণ্ডলীর ভিতরে একদিকে দুই বাহু ও আর এক দিকে দুই পা ঝুলিয়ে খুববাঁকানো ধনুকের মতো ছটফট ছটফট করছে মস্ত একটা মানুষের দেহ। তার সর্বাঙ্গ রক্তে আরক্ত। তার নাক-মুখ-চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে রক্তের ফিনিক। চিনতে বিলম্ব হল না, সে হচ্ছে রাঘব ডাকাত।

রাঘব তখনও দৃষ্টিশক্তি হারায়নি, নরেন্দ্রকে চিনতে পারলে। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, পায়ে পড়ি, ক্ষমা করো! আমাকে বাঁচাও?

নরেন্দ্রের মনে পড়ল ভৈরবীর শেষ কাতর মিনতি। বললে, রুনু, ও লোকটাকে তুমি দয়া করে ছেড়ে দাও।

রুনু হয়তো তার কথা বুঝতে পারলে না, কিংবা হয়তো বুঝেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। আচম্বিতে সে শুড়ের সঙ্গে রাঘবের দেহ তুলে ফেললে শূন্যে এবং তারপর মারলে তাকে পাহাড়ের উপরে এক আছাড়। রাঘব একবার আর্তনাদ করবার সময় পেলে না, তার দেহ একবার নড়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু রুনুর আক্রোশ তখনও কমজোরি হবার নাম করলে না। সে গর্জন করতে করতে নিজের সামনের দুই পা দিয়ে রাঘবের দেহের উপরে উঠে তাকে ক্রমাগত থেতলে ফেলতে লাগল—সে যেন মত্ত মাতঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য! দেখতে দেখতে রাঘবের দেহ হয়ে গেল একটা রক্তমাখা মাংসের তাল; তখন সেটাকে দেখলে তা যে মানুষের দেহ, মনে জাগে না এমন সন্দেহও ।

সে দৃশ্য টুনু আর দেখতে পারলে না, দুই হাতে দুই চোখ ঢেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ওকে ছেড়ে দে রুনু, ওকে ছেড়ে দে! চল, আবার আমার ঘরে ফিরে যাই।

একাদশ
টুনুর রাজকুমার

তোমরা কেউ আলো-বীণার সুর শুনেছ? এ সুর বাইরের কানে শোনা যায় না, শুনতে হয় প্রাণের কানে। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বীণা বাজতে থাকে আকাশে আকাশে, বিহঙ্গদের কণ্ঠে নয়, মনের আসরে, বিন্দুর মতো ছোটো তৃণকুসুমের আনন্দের ছন্দে। এই বীণার আহ্বান-তান শুনেই তো বাসা থেকে দলে দলে পুঞ্জে পুঞ্জে বেরিয়ে পড়ে মধুকর আর রঙিন প্রজাপতি। এতটুকু যে শামুক, যার কান নেই, সে-ও এই বীণার রাগিণী নিজের ছোট্ট হৃদয়ের মাঝখানে অনুভব করে অন্ধকার থেকে এসে উপস্থিত হয় মুক্ত অসীমের ছায়ায়। সকালে মানুষ যে ভৈরবী রাগিণী গায় সে তো এই আলো-বীণার ছন্দধ্বনি অনুসরণ করেই।

আজও সকালে বনে বনে স্নিগ্ধঘন শ্যামলতার উপরে যেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচা সোনামাখা রোদটুকু, সেইখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এই আলো-বীণার সুর, এই আলোবীণার ছন্দ, এই আলো-বীণার আনন্দ। তারাও মনে-প্রাণে অনুভব করছিল এই অপূর্ব আলোক-বীণার বিচিত্র আশীর্বাদটুকু—টুনু ও নরেন্দ্র।

বেলগাছের পাশের সেই ঝোপ । এই নিরিবিলি জায়গাটি তাদের বড়ো মিষ্টি লাগে। এখান থেকে একদিকে তাকালে দেখা যায় কতকগুলো বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত, শান্ত সেই কাঠুরে পল্লিটি। আর একদিকে দেখা যায়, মস্ত একটা তেপান্তর দিকচক্রবাল রেখা পর্যন্ত করছে ধু-ধু-ধু-ধু—রূপকথার রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে আর সওদাগরের ছেলে সেখান দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে কোন সেকালে যাত্রা করত হয়তো কোনও বিপদগ্রস্তা অজানা, রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। আর একদিকে দেখি, অনন্তের পূজা-মন্দিরের মতো একটা উচ্চ

শৈলশিখর উঠে গিয়েছে নীলাকাশকে চুম্বন করতে। এবং এখান থেকে দেখা না গেলেও কানে শোনা যায় একটি স্রোতস্বিনীর ছন্দসুন্দর নৃত্যসংগীত।

টুনু!

কি নরেন?

আজ আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য খবর দেব।

আশ্চর্য খবর?

হ্যাঁ টুনু।

কিন্তু আমি যদি আশ্চর্য না হই?

তুমি যদি আশ্চর্য না হও, তাহলে পৃথিবীতে আমার মতন আশ্চর্য আর কেউ হবে না?

তুমি এমন কী আশ্চর্য খবর আমাকে দিতে পারো, নরেন?

আমি তোমার বাবা আর মায়ের সন্ধান পেয়েছি।

টুনুর দুই চোখ হয়ে উঠল বিস্ফারিত। সে নিজের কানকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। সচমকে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, আমার বাবা আর মায়ের খবর! আমি ভুল শুনছি না তো? তুমি কী বললে নরেন আর-একবার বলো তো?

তোমার বাবা আর মায়ের খবর আমি পেয়েছি। তারা কোথায় থাকেন তাও আমি জেনেছি।

গভীর আবেগে ও উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল টুনুর বুক। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে সে বললে, নরেন, সত্যি করে বলো, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ না তো?

নরেন্দ্র বললে, ছিঃ টুনু, এমন কথা নিয়ে কেউ কখনও ঠাট্টা করতে পারে?

নিজের দুই হাতে নরেন্দ্রের হাত চেপে ধরে টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমার মাকে, আমার বাবাকে তাহলে তুমি দেখেছ? আমি কাঠুরের মেয়ে হয়ে বনবাসে আছি, তারা তা জানতে পেরেছেন? তারা আবার আমাকে ফিরিয়ে নেবেন? বলতে বলতে টুনুর দুই চোখ ভরে ফোটা ফোটা অশ্রুজল গাল বেয়ে ঝরতে লাগল।

নরেন্দ্র বললে, শান্ত হও টুনু, শান্ত হও। আমি এখনও তাদের চোখে দেখিনি। আমি এখনও তাদের তোমার খবর দিতে পারিনি। তবে, তারাই যে তোমার মা আর বাবা, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই।

টুনু বললে, তাহলে তুমি এখুনি আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলো।

তা হয় না টুনু, সে এখান থেকে অনেক দূর। অন্তত পঁচিশ মাইলের কম নয়।

টুনু দৃঢ়স্বরে বললে, হোক গে পঁচিশ মাইল, আমি ঠিক হেঁটে যেতে পারব। তুমি জানো না নরেন, এখনও আমি রোজই স্বপ্নে আমার বাবাকে আর মাকে দেখতে পাই। দেখি আর কাঁদি, দেখি আর কাঁদি। তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল আবার নতুন কান্নার ধারা। কাঁদতে কাঁদতে এবং সেইসঙ্গে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে আবার বললে, নিজের বাবা আর মাকে কখনও কি ভোলা যায় নরেন। কখনও ভোলা যায় না।

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তোমাকে আজ আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি।

টুনু বললে, এত বড়ো খবরের পর তুমি আবার আরও কী কথা বলতে চাও?

নরেন্দ্র একটুও ইতস্তত করলে না। সহজ স্বরে, স্পষ্ট ভাষায় বললে, টুনু, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

টুনু সবিস্ময়ে খানিকটা পিছনে সরে গেল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, এ কী কথা বলছ নরেন?

নরেন্দ্র বললে, আমি তোমাকে সোজা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সোজা জবাব দাও। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?

কেন? তুমি কী জাত আর আমি কী জাত? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?

নরেন্দ্র হেসে ফেলে বললে, বনে থাকো কাঠুরের ঘরে। লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানো না। সমাজের কথাও কিছুই শোনেনি। আমি ভাবছি না, তবু তুমি জাতের ভাবনা ভাবছ? শোনো টুনু! ও কথা নিয়েও তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এটাও আমি জেনেছি যে তোমরা আর আমরা হচ্ছি একই জাতের। তোমরাও বামুন, আমরাও বামুন।

টুনু কী ভাবতে লাগল নতমুখে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, আমি শুনেছি, তুমি রাজার ছেলে। তুমিও হয়তো একদিন রাজা হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার মা-বাবাও নিশ্চয়ই নারাজ হবেন না; কিন্তু—

আবার একটা কিন্তু কেন টুনু? এখন তুমি রাজি আছ কি না, সেই কথাই বলো।

টুনুর মুখে ফুটে উঠল লজ্জার রাঙা রং এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটি হাসির ভাব। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, নরেন, তোমাকে কি আমি না বলতে পারি?

বিপুল আনন্দে নরেন্দ্রে মুখ চোখ আর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল প্রফুল্ল। উচ্ছসিত কণ্ঠে সে বললে, টুনু, টুনু! তাহলে এখনই তুমি চলো আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে।

তোমার বাড়িতে!

হ্যাঁ টুনু! তুমি যখন আমার কথায় রাজি হয়েছ, তখন এখানে তোমাকে আর আমি এক মিনিটও থাকতে দেব না। রাঘব ডাকাত মারা গিয়েছে, কিন্তু তার প্রকাণ্ড দলবলের অনেকেই এখনও বেঁচে আছে। তারা যখন তাদের সর্দারের পরিণামের কথা শুনবে, তখন নিশ্চয়ই আবার এসে তোমাদের উপরে হানা দেবে। তখন তাদের প্রতিহিংসা থেকে তুমিও বাঁচবে না, দুখিরাম আর পার্বতীও বাঁচবে না। আমি এখনই তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। ভয় নেই, খালি তোমাকে নয়, দুখিরাম আর পার্বতীকেও। আমি তাদের আশ্রয় দেব। তারা বড়ো ভালো লোক। আমি তাদের সারা জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দেব। এর পরেও তোমার আর কোনও আপত্তি থাকতে পারে টুনু?

টুনু শোনা যায় কি না-যায় এমন স্বরে বললে, না নরেন, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের আগে আমার হারিয়ে যাওয়া মা-বাবাকে কি দেখতে পাব না?

নরেন্দ্র বললে, নিশ্চয়ই! আমার বাড়িতেই তুমি তাদের দেখা পাবে। তোমার বাবাই তো তোমাকে সম্প্রদান করবেন।

ঠিক সেই সময় গদাই লশকরি চালে রুনু এসে হাজির। সে একবার টুনুর মুখের দিকে তাকালে। তারপর শুড় দিয়ে তার একটা হাত ধরে টান মারতে লাগল। তার মনের ভাবটা বোধ হচ্ছে এইরকম: কই গো খুকুমণি, আজ তিন-চার দিন তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওনি! আজও বেলা বাড়ছে, তুমি কি আজও বেড়াতে যাবে না?

টুনু তার মনের ভাব বুঝে হেসে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, না রে রুনু, বনের ভিতরে আর আমি বেড়াতে যাব না। বনের ভিতরে বড়ো ভয়! জন্তুর ভয় না, মানুষের ভয়। নরেন আমাকে বেড়াতে যেতে বারণ করেছে।

রুনু তবু ছাড়ে না, আবার তাকে ধরে টানাটানি করে। বনের ভিতরে টুনুর সঙ্গ তার ভারী ভালো লাগে। যতক্ষণ টুনু তার সঙ্গে থাকে, সারা দিন-রাতের ভিতরে সেই সময়টুকুই সে সবচেয়ে উপভোগ করে।

বেগতিক দেখে শেষটা টুনু ছুটে পালিয়ে গেল নাছোড়বান্দা রুনুর কাছ থেকে। রুনু ম্রিয়মাণ ভাবে টুনুর পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর টুনুকে যখন দেখা গেল না তখন ধীরে ধীরে একলাই ধরলে বনের পথ।

নরেন সকৌতুকে বললে, কী রে রুনু, তোর অভিমান হল নাকি রে? রুনু তার দিকে ফিরেও তাকালে না। তার কথার মানে বুঝতে পারলে কি না তাও বোঝা গেল না। খানিক এগিয়ে একটা মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বাদশ

রুনুর গোয়েন্দাগিরি

সত্যই রুনুর মনে হয়েছিল অভিমান। দারুণ অভিমান। টুনু আর তার সঙ্গে বেড়াতে আসে না, টানাটানি করলেও ছুটে পালিয়ে যায়, এতে গাধারই অভিমান হবার কথা, আর সে হচ্ছে বুদ্ধিমান জীব, হাতি। আমরা মানুষ, আমরা যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে পারি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি সে কথা না শুনলে আমাদেরও মনে কম অভিমান হয় না। হয়তো তার কথা না শোনার, সে অবাধ্য হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সব সময় আমরাও সেটা বুঝতে পারি না, এবং মনে মনে আহত না হয়েও থাকতে পারি না ।

রুনু আজ সাত দিন টুনুকে দেখতে যায়নি। সারাদিন সরোবরের ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই রোজ যেখানে বসে হাতিদের সভা। রুনু কিন্তু তাদের সঙ্গেও মেশে না। অন্য দিকে তাকিয়ে একলাটি মনে মনে কী যে ভাবে তা সেই জানে। যখন বেশি গরম বোধ হয়, মাঝে মাঝে জলে নেমে তিন-চারটি ডুব দিয়ে আবার উপরে উঠে আসে।

রুনুর হাবভাব দেখে অন্য হাতিরা বিস্মিত হয়। বাচ্চা হারালে হস্তিনীরা যে-রকম ব্যবহার করে, রুনুও সেই রকম ব্যবহার করছে দেখে অন্যান্য হাতিরা তার কারণ বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে এক একটা কমবয়সি হাতি কৌতুহলী হয়ে রুনুর কাছে এসে দাঁড়ায়, বোধহয় তার দুঃখের কারণ জানবার জন্যে। কিন্তু রুনু তাদের মোটেই আমল দেয় না, উলটে খাপ্পা হয়ে তেড়ে মারতে যায়। কমবয়সি হাতিগুলো চটপট সরে পড়ে নিরাপদ ব্যবধানে।

তখন সরোবরের পূর্ব তীরে তার জল-জগতে দেখা যাচ্ছিল উদীয়মান সূর্যের রক্তমুখ। পৃতিবীর মাটির উপরে সূর্য উঠছে যত উপরের দিকে, জলের

ছায়াসূর্য নেমে যাচ্ছে ততই পাতালের দিকে। সরোবরের দিকে দিকে নানা জাতের জীব একে একে বা দলে দলে দেখা দিতে লাগল। বন্য বরাহ, বন্য মহিষ, ছোটা ে ও বড়ো জাতের হরিণ, শূকর, কুকুর এবং হরেক রকম শিকারি ও নিরীহ পাখিরা। তারপর দল বেঁধে হাতিরাও এল খেলা করতে। একদিকে ডাঙার উপরকার ঝোপের ভিতর বসে একটা লোভী চিতাবাঘ উকিবুকি মেরে বার বার তাকিয়ে দেখছে, জলপান করতে এসেছে কেমন নধর নধর হরিণগুলি। চিতাবাঘটা তাই দেখছে, আর বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে নাক আর উপর-ঠোঁটটা। কিন্তু বাইরে বেরুবার ভরসা তার কিছুতেই হচ্ছে না, কারণ ওখানে দলে দলে চরছে মহিষ আর বরাহের দল। হতভাগাদের শিঙে আর দাঁতে যে কত ধার সেটা তার জানতে বাকি নেই।

আর একদিকের জঙ্গলের ধারে কেবল কান আর চোখ বার করে তাকিয়ে তাকিয়ে এদিকটা দেখছে গোটা-চারেক শেয়াল। তাদের দৃষ্টি চকাচকি ও অন্যান্য হাসদের দিকে। কিন্তু তাদেরও বুকের পাটা এত বড়ো নয় যে এমন সব বদমেজাজি জানোয়ারদের এড়িয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করবে।

এখানে মনের আনন্দে নির্বিবাদে শিকার করছে কেবল বক, আর মাছরাঙারা। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকগুলি দূরসম্পর্কীয় ভাই নানা গাছের ডালের উপরে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ তারা চিতাবাঘটাকে আবিষ্কার করে ফেললে। তারপরেই গাছে গাছে জাগল সে কী বিষম উত্তেজনা ও দাপাদাপি, লাফালাফি! প্রায় শতাধিক বানরের কিচিরমিচির চিৎকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেখানকার আকাশ-বাতাস। সেখানে যত জানোয়ার ছিল সকলেরই দৃষ্টি এই বিশেষ ঝোপটার দিকে আকৃষ্ট হতে বিলম্ব হল না। একটা বাচ্চা হাতি কৌতুহলী হয়ে সেই ঝোপটা তদারক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সাবধানি মা তাড়াতাড়ি জল থেকে উপরে উঠে শুড়ের বাড়ি দিয়ে বাচ্চাটাকে দিলে রীতিমতো এক ঘা। বন্য মহিষরা জোট বাঁধতে লাগল ঝোপটার দিকে সদলবলে যাত্রা করবে বলে।

ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠবার উপক্রম করছে দেখে চিতাবাঘটা এক লাফ মেরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে সাঁৎ করে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল হলদে একটা বিদ্যুৎ-রেখার মতো। তারপর ধীরে ধীরে সেখানকার স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এল। সেই স্তব্ধ সুনীল আকাশ, সেই শান্ত হরিৎ বনভূমি, সেই ঢলঢলে সরোবরের রোদমাখা সোনার জল ।

কিন্তু এইসব শান্তি ও অশান্তির দৃশ্য দেখবার জন্যে রুনু আজ এখানে হাজির ছিল না। রাগ করে সাত দিন সে টুনুর সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু আজ আর তার মন মানা মানল না কিছুতেই। সেই স্নেহের পুতলি আজ তাকে আবার টেনে নিয়ে চলল কঠিন আকর্ষণের টানে। বিষের মতো লাগছে তার চিরদিনের চেনা এই বনটাকে। কালো রাত্রির নিকষে ভোরের আলোর প্রথম সোনার আঁচল পড়বার আগেই রুনু আবার যাত্রা করলে টুনুদের সেই কাঠুরেপাড়ার দিকে। যেতে যেত তার মনে হতে লাগল, আজ যেন অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে এই বনের পথটা, যেন কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। পথে এক জায়গায় একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাধা দেখে অত্যন্ত অধীরভাবে সেই ভারী গাছটাকে সে শুড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে একটানে পথ থেকে সরিয়ে দিলে। গাছের তলায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল মস্ত একটা গোখরো জাতীয় সাপ। সে তৎক্ষণাৎ ফণা তুলে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শুড়ের এক ঘা খেয়ে কোথায় যে ছিটকে গিয়ে পড়ল কিছুই বোঝা গেল না। উপর-উপরি এই দুই বিয়ের জন্য রুনুর মন আরও বেশি বিগড়ে গেল। তারপর সে ছুটতে আরম্ভ করল।

ওই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সেই বনটা, যার স্বচ্ছ ছায়ার তলায় আছে সেই ঘুমন্ত কাঠুরে গ্রামটি। বনের উপরে দেখা যাচ্ছে তিন-চারটে ধোঁয়ার রেখা। তারা প্রমাণ দিচ্ছে, রান্নার কাজে নিযুক্ত হয়েছে কাঠুরেদের গিন্নিরা। রুনু ভাবলে, এতক্ষণে টুনুর ঘুম নিশ্চয় ভেঙে গিয়েছে, খুব সম্ভব এখন সে ঘরের দাওয়ায়

এসে বসে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। টুনু হয়তো রাগ করে আজ আমাকে ধমক দেবে। কিংবা সে হয়তো অভিমান করে আমার সঙ্গে আজ কথাই কইবে না। নরেন বোধহয় এখনও আসেনি। এত সকাল সকাল সে এখানে এসে পৌঁছতে পারে না।

বেলগাছের পাশে সেই ঝোপটা। এইখানে বসেই টুনু আর নরেন রোজ গল্পসল্প করে। ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রুনু কাঠুরে পল্লির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু কই, টুনু তো ওখানে নেই! তার মা আর বাবাকেও দেখা যাচ্ছে না। পার্বতী তো এমন সময় রোজ দাওয়ায় বসে দুখিরামকে কাঁচালঙ্কা, তেঁতুল আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেতে দেয়। আরে, টুনুদের ঘরের সব দরজা-জানলা যে একেবারে বন্ধ! এমন ব্যাপার তো সে আর কোনওদিন দেখেনি! এ আবার কী হল?

রুনু তাড়াতাড়ি টুনুদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বার-কয়েক চিৎকারও করলে, কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। টুনুরা যদি কাঠুরেপাড়ার অন্য কারুর বাড়িতে গিয়ে থাকে এই আশায় সে একে একে প্রত্যেক ঘরটাই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এল। তাকে দেখে কাঠরেপাড়ার কেউ আর ভয় করে না। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রুনু, রুনু করে ডেকে তার কাছে ছুটে এল। কাঠুরেদের কোনও কোনও বউ তাকে আদর করে খাবার জন্যে এটা ওটা সেটা এগিয়ে দিলে। কিন্তু আজ আর জাগ্রত হল না রুনুর ক্ষুধা। সকলে তাকে কী সব বলতে লাগল। তাদের কথায় বার বার টুনুর নাম শুনে রুনু বুঝলে, তারা তাকে টুনুর কথাই বলতে চায়। এইটুকু সে বুঝলে বটে, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই বুঝতে পারলে না। তবে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে তার বাকি রইল না যে টুনুদের কেউ আজ আর এখানে নেই।

কিন্তু নেই তো গেল কোথায়? অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওই ফল হল না। আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে চলল। ফিরতে নারাজ পা গুলোকে কোনও

রকমে টেনে টেনে সে অগ্রসর হতে লাগল। তখন তার শ্রান্ত, ক্লান্ত ও হতাশ মূর্তি দেখলে সত্য-সত্যই দুঃখ হয়।

রুনু বনের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, এমন সময় পিছনে একটা শব্দ শুনে আবার সে ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, বনের পথ ধরে আসছে টুনুর বাবা দুখিরাম। কিন্তু সে একলা। তবে দুখিরাম যখন এসেছে একটু পরে টুনুও নিশ্চয় এসে দেখা দেবে। দুখিরাম যখন হাসতে হাসতে আসছে, টুনুর তখন বিপদ-আপদ কিছু হয়নি। রুনু হাসতে পারে না বটে, কিন্তু সুখ বা আনন্দ না হলে মানুষ যে হাসে না এ জ্ঞানটুকু তার বেশ আছে।

দুখিরাম রুনুকে দেখতে পেলে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে সে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। রুনু সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে দুখিরামকে দেখে কাঠুরেদের এক মোড়ল শুধোলে, কী গো দুখিরাম, হঠাৎ তুমি যে ফিরে এলে?

দুখিরাম হেসে হেসে জবাব দিলে, ভায়া, পাবর্তী ভুলে তার পায়জোড় জোড়া ফেলে গিয়েছে সেইটে নিয়ে যেতে এলুম আর কী?

দুখিরাম নিজের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। খানিক পরে বাইরে এসে দরজায় কুলুপ লাগিয়ে আবার অবলম্বন করলে বনের পথ।

দুখিরাম এলই বা কেন, আবার চলেই বা যাচ্ছে কেন? এর কারণ ধরতে না পারলেও একটা কথা রুনু অনুমান করতে পারলে। দুখিরামের পিছনে পিছনে গেলে নিশ্চয়ই সে আবার পাবে টুনুর দেখা। সে-ও তখন তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তার মনে জাগল একটা অদ্ভুত সন্দেহ হয়তো দুখিরাম চায় না যে টুনুকে নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ইচ্ছা করেই তারা টুনুকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছে। পিছনে পিছনে সে যাচ্ছে, হয়তো এটা জানতে পারলে দুখিরামও তাকে ফাকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। অতএব, সে যে পিছু নিয়েছে, দুখিরামকে কিছুতেই এটা জানতে দেওয়া হবে না।

ত্রয়োদশ

রুনু-টুনুর শেষ অ্যাডভেঞ্চার

জমিদারবাড়িতে আজ ভারী ধুমধাম।

বাড়ির দিকে দিকে উড়ছে রঙিন নিশান, নহবতখানায় সানাই ধরেছে সাহানা রাগিণী, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বহুজনের কণ্ঠে আনন্দ কলরব।

বাড়ির পাশের ময়দানে খাটানো হয়েছে মস্ত বড়ো শামিয়ানা, এবং সর্বাঙ্গে তার পুষ্পপল্লবের অলঙ্কার। শামিয়ানার তলায় ধবধবে সাদা বিছানার উপরে বসে আছে ভালো ভালো পোশাক পরে দলে দলে লোক। লাল রঙে ছোপানো কাপড় পরে চাকর ও দরোয়ানরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে এখানে ওখানে সেখানে। ভারে ভারে দই, ক্ষীর এবং খাবারের থালা নিয়ে লোকের পর লোক জমিদারের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রংচঙে জামা ও ইজের পরে ঘোরাফেরা করছে সগর্বে। খানিক তফাতে আস্তকুড়ের উপরেও পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে হরেক রকম খাবারের ফেলে-দেওয়া অংশ। সেখানে বসেছে কুকুরদের ভোজন-সভা। কিন্তু সেখানে কেবল ভোজনই চলছে না, তর্জনগর্জন ও কামড়া-কামড়িও চলছে দস্তুরমতো। চালাক কাকগুলো কিছু তফাতে বসে আছে রীতিমতো সতর্ক হয়ে, এবং একটু ফাক পেলেই টপ টপ করে খাবারের টুকরো তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসছে গাছের ডালে। কোনও কোনও কাক খাবার ফাঁক না পেয়ে বিষম চটে যাচ্ছে এবং কম-সতর্ক কুকুরগুলোর ল্যাজ কামড়ে দিয়ে অথবা মাথায় ঠোকর মেরে নিরাপদ ব্যবধানে চলে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে নরেনের সঙ্গে টুনুর বিবাহ হয়ে গেছে। আজ তাদের বাসি বিয়ে। উঠানের উপরে ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চেলির কাপড় পরা ও গীট-ছড়া-বাঁধা বর ও বধূ। দুজনকে কী চমৎকারই মানিয়েছে! আর সবচেয়ে দেখতে মিষ্টি লাগছে টুনুর হাসি হাসি মুখে লজ্জার গোলাপি রংটুকু। এয়োরা উলুরব তুলে

বর ও বধূকে বেষ্টন করে বরণ করছেন এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিমুখ হচ্ছে টুনুর গর্ভধারিণী সুরমার। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আর-একটি ভদ্রলোক। তারও মুখে আনন্দের হাসি থাকলেও তার চোখেও দেখা যাচ্ছে দুয়েক ফোটা অশ্রুজল। তিনি আর কেউ নন, টুনুর পিতা অসিত। কত কাল পরে হারা-মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন, তাই অতি আনন্দে মনের আবেগে মাঝে মাঝে পাচ্ছে তার কান্না।

আচম্বিতে বাইরে উঠল একটা ভয়ানক গোলমাল। চারিদিকে শোনা গেল ছুটাোছুটি হুটোপুটির শব্দ। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে পালিয়ে আসতে লাগল দলে দলে।

তারপরেই শোনা গেল আরও কতগুলো চিৎকার—

পালাও, পালাও!

খ্যাপা হাতি, খ্যাপা হাতি!

ওরে, পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়! হাতিটা যে রাজবাড়ির দিকে ছুটে আসছে রে!

সচমকে নরেন চাইলে টুনুর মুখের পানে, এবং টুনু চাইলে নরেনের মুখের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হল না। এ নিশ্চয়ই রুনুর কীর্তি। কিন্তু সে রাজবাড়ির ঠিকানা জানলে কেমন করে?

বাইরে হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম করে পাঁচ-পাঁচ বার বন্দুকের আওয়াজ হল। আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল, আর ভয় নেই! পাগলা হাতিটা গুলি খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গিয়েছে!

টুনুর সারা মুখখানা মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। প্রাণপণে চিৎকার করে সে কেঁদে উঠল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে গাঁটছড়া খুলে ফেলে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরের দিকে। এবং তার পিছনে পিছনে ছুটল নরেন্দ্রও। সবাই আড়ষ্ট, বিস্মিত, হতভম্ব!

শামিয়ানার পাশে রক্তাক্ত মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে রুনু। তার দেহের নানা জায়গা দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। দেখলে মনে হয়, দেহে তার প্রাণ নেই। রুনু! রুনু! আমার রুনু! ওরে রুনু রে! কাদতে কাঁদতে এই বলে চেঁচিয়ে উদভ্রান্ত ভাবে টুনু ছুটে গিয়ে রুনুর গায়ের উপর আছড়ে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু তখনও রুনু মরতে পারেনি—বোধহয় টুনুকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে। টুনুর কণ্ঠস্বর পেয়েই তার কানদুটাে নড়ে নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে একটুখানি মুখ তুলে চোখ খুলে একবার সে টুনুর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। ধীরে ধীরে শুড় তুলে টুনুর কণ্ঠদেশ একবার জড়িয়ে ধরলে। পরমুহূর্তেই তার মাথাটা অবশ হয়ে ধপাস করে মাটির উপর পড়ে গেল। তার দেহ একেবারে আড়ষ্ট। টুনুকে দেখতে দেখতে রুনুর মৃত্যু হল। সকলে যখন রুনুর রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর থেকে টুনুকে টেনে তুললে তখন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।